সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 4'4

জলের তলার রাজপুরা



668

জলের তলার রাজপুরী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পরিবেশক

এন ভট্টাচার্য এণ্ড কোং

১৩, কলেজ রো / কলিকাতা—৯

মূল্য : দশ টাকা মাত্র

প্রচ্ছদ—শ্রীদেবাশিস দেব

সৌমেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, ১৩, কলেজ রো, কলি-৯ কর্তৃক প্রকাশিত ও শীতলচন্দ্র রায়; তারকেশ্বর প্রেস ৩, শিবু বিশ্বাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

৮৩-র বঙ্কিম পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিক শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটদের জন্য স্বনির্বাচিত সব রকমের গল্পের অপূর্ব সংকলন।

বাংলার ছোট ছেলেমেয়েদের
কাছে
শর্মিলা প্রকাশনীর আরেকটি উপহার

এতে আছে

জলের তলার রাজপুরী

বাবা শহরে গেছেন একটা টেলিগ্রাম করবার জন্য। মা শুয়ে শুয়ে একটা মোটা উপন্যাস পড়ছেন, এই সময় চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো পুপ্‌লু।

একেবারে চুপচাপ দুপুর। নাগিন লেকের ওপরে ভাসছে দশ বারোটি হাউসবোট। কয়েকটা হাউসবোটের ছাদে শুয়ে শুয়ে সাহেব মেমরা রোদ পোহাচ্ছে।

আজকের দিনটা খুব সুন্দর। ঝকঝক করছে রোদ। দূরে দেখা যাচ্ছে বরফের মুকুট পরা পাহাড়ের সারি। এক ঝাঁক হাঁস ডানা দুলিয়ে উড়ে যাচ্ছে সেই পাহাড়ের দিকে।

পুপ্‌লুদের হাউস বোটটা বেশ বড়। ঠিক যেন একটা বাড়িরই মতন। দু'খানা ঘরে রয়েছে দু'দল জার্মান আর আমেরিকান, আর একটা ঘরে বাবা-মা'র সঙ্গে পুপ্‌লু। এ ছাড়া একটা বেশ বড় ডাইনিং রুম, তারপর একটা বসবার ঘর, বেশ সোফা টোফা আর রেডিও দিয়ে সাজানো। তার সামনে একটা ছোট্ট ঘেরা বারান্দা।

পুপ্‌লু সেই ঘেরা বারান্দাটায় এসে দাঁড়ালো।

শ্রীনগর থেকে এই নাগিন লেকটা খানিকটা দূরে। এখানকার জল নীল রঙের আর বেশ পরিষ্কার, ডাল লেকের মতন নোংরা নয়। বারান্দায় এসে দাঁড়ালেই জলের তলার অনেকখানি দেখা যায়। জলের তলায় অনেক রকমের গাছ, ঠিক মনে হয় একটা জঙ্গল। তার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় এক একটা রুপোলি মাছের ঝিলিক।

একটু দূরে ছোট্ট একটা ডিঙ্গি নৌকোয় বসে মাছ ধরছে সেলিম।

এই সেলিম পুপ্‌লুর চেয়ে বেশি বড় নয়। পুপ্‌লুর বয়েস আট,

আর সেলিমের বয়েস বড় জোর দশ বছর। কিন্তু ঐটুকু বয়েসেই সেলিম কী সুন্দর নৌকো চালাতে পারে আর বড়শি দিয়ে টপাটপ্ মাছ ধরে। তা ছাড়াও সেলিম চা বানাতে জানে তরকারি কুটতে জানে।

সেলিম একবার এদিকে তাকাতেই পুপ্‌লু হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকলো।

সেলিম ডিঙ্গি নৌকোটা নিয়ে চলে এলো হাউস বোটটার কাছে।

সেলিম কথা বলে কাশ্মীরী ভাষায়। তা ছাড়া সে হিন্দী উর্দু ও জানে। আর কয়েকটা ইংরেজি শব্দ শুধু বলতে পারে। পুপ্‌লু কাশ্মীরী বা হিন্দী-উর্দু কিছুই জানে না, তবু তার কথা সেলিম ঠিক বুঝে যায়।

পুপ্‌লু জিজ্ঞেস করলেন, সেলিম, ক'টা ফিস্ ধরলে ?

সেলিম একটা ঝুড়ি তুলে দেখালো। এর মধ্যেই সে দশ বারোটা মাছ ধরে ফেলেছে। মাছগুলো কৈ মাছের চেয়েও খানিকটা বড়, অনেকটা তেলাপিয়া মাছের মতন দেখতে। এখনো লাফাচ্ছে।

পুপ্‌লু বললে, আমিও মাছ ধরবো ! আমায় তোমার নৌকোতে নেবে ?

সেলিম বললো, কেয়া ?

পুপ্‌লু বললে, আই ক্যাচ ফিস্। তোমার বোটে আমায় টেক্ করবে ?

সেলিম বললো, আও।

সব হাউস বোটের সঙ্গেই একটা ছোট্ট সিঁড়ি লাগানো থাকে। সেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে সাবধানে পুপ্‌লু উঠলো ডিঙ্গি নৌকোটায়।

ছোট্ট নৌকো, দু'জনের ভারেই একটু জল উঠলো।

সেলিম নৌকোটাকে খানিকটা দূরে নিয়ে গিয়ে ছিপ ফেললো জলে।

পুপ্‌লু বললো, আমায় দাও। আমি কোনো দিন মাছ ধরিনি।

সেলিম ছিপটা তুলে দিল পুপ্‌লুর হাতে।

তারপর দু'জনেই এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলো জলের দিকে। স্বচ্ছ জলের মধ্যে দেখা যায়, মাঝে মাঝে ঝাঁঝির জঙ্গল থেকে দু' একটা মাছ বেরিয়ে এসে এদিক ওদিক একটু ঘুরে আবার সাঁৎ করে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে।

একবার একটা মাছ বড়শির টোপটার কাছে এসে ঘুরে ঘুরে কয়েকবার গন্ধ নেবার পর একবার ঠোকরাতেই সেলিম বললো, খিঁচো, খিঁচো।

পুপ্‌লু খিঁচো কথাটার মানে জানে না। সে তো আগে কখনো ছিপ হাতে নেয়নি, কখন টান মারতে হয় সে জানবেই বা কী করে।

সেলিম তখন পুপ্‌লুর হাতে ধরা ছিপটাই নিজে ধরে মারল এক টান। অমনি, কী আশ্চর্য ব্যাপার, সত্যিই উঠে এলো একটা মাছ। ছট্‌ফট্ ছট্‌ফট্ করছে। পুপ্‌লুর জীবনে এই প্রথম মাছ ধরা। টানটা সেলিম মারলেও ছিপটা তো ছিল তার হাতে।

পুপ্‌লুর কী আনন্দ। ইচ্ছে হলো সেই নৌকোর ওপর লাফাতে। লাফালেই কিন্তু ডুবে যাবে নৌকোটা, আর পুপ্‌লু সাঁতারও জানে না।

সেলিম মাছটা খুলে নিয়ে আবার ছিপ ফেললো জলে। এই সময় সরু রিনরিনে গলায় একজন চেঁচিয়ে উঠলো, হেই, কাম্ হিয়ার ; কাম হিয়ার ; টেক মী।

ওরা তাকিয়ে দেখলো, 'স্টার অফ ইণ্ডিয়া' নামের হাউসবোট থেকে ওদেরই বয়েসী একটা মেয়ে হাতছানি দিয়ে ওদের ডাকছে।

ঐ মেয়েটিকে চেনে পুপ্‌লু। ওর নাম অ্যালিস, ওরা আমেরিকান। অ্যালিসের চুলের রং একদম সোনালি। আর মেমের মেয়ে যখন গায়ের রং তো ফর্সা হবেই। চোখ দুটো নীল। ঠিক যেন একটা পুতুল।

পুপ্‌লু 'অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড' নামে গল্পের বইটা পড়েছে। এই মেয়েটিকে দেখে তার মনে হয়েছিল সেই গল্পের অ্যালিস। কিন্তু এই মেয়েটা বেশ রাগী।

অ্যালিস কথা বলে বেশ রাগী সুরে আর ইংরেজিটাও খুব জড়ানো ধরনের। তবু পুপ্‌লু আর সেলিম ওর কথা মোটামুটি বুঝে যায়।

অ্যালিস ওদের সঙ্গে নৌকোয় উঠতে চাইছে। পুপ্‌লু সেলিমকে বললো, ওকেও নিয়ে নাও না।

সেলিম জানালো যে এইটুকু নৌকোতে তিনজনের জায়গা হবে না। নৌকো ডুবে যেতে পারে।

অ্যালিস আবার চিৎকার করে বললো, টেক মী উইথ ইউ।

পুপ্‌লু বললো, তিনজন হবে না। স্মল বোট, নো থ্রি।

অ্যালিস হুকুম করে রাগী গলায় বললো, আই ওয়ান না নাও-ও।

মেয়েটাকে বেশী রাগাতে চায় না ওরা। সেলিম তার ডিঙ্গি নৌকোটো নিয়ে গেল 'স্টার অফ ইণ্ডিয়া' হাউসবোটটার কাছে। অ্যালিস তাড়াহুড়ো করে এমনভাবে লাফিয়ে নামলো যে তক্ষুণি ডুবে যেত ছোট্ট নৌকোটা। সেলিম আরে আরে করে উঠলো।

পুপ্‌লু অ্যালিসকে বাংলায় বললো, একদম চুপ করে বসো, নড়াচড়া করবে না।

অ্যালিস তার কথা অগ্রাহ্য করে ঠোঁট উল্টে বললো, আই নো সুইমিং।

সেলিম আবার ডিঙ্গি নৌকোটা সরিয়ে নিয়ে গেল দূরে। আবার ছিপ ফেললো।

আর একটা মাছ উঠতেই অ্যালিস বললো, ও, হাউ লাভলি! আ রিয়াল ফিস! স্টিল অ্যালাইভ! লেট মী, লেট মী—

এবার অ্যালিস নিজে মাছ ধরতে চায়।

পুপ্‌লু তাকে বিজ্ঞের মতন উপদেশ দিল, কখন টান মারতে হয় তুমি জানো? ঠিক মাছটা এসে যখন ঠোক্‌রাবে···

অ্যালিস জিজ্ঞেস করলো, হোয়াট?

পুপ্‌লু বললো, হোয়েন ফিস্ আস্তে আস্তে ঠোক্‌রাবে, ইয়ে ঠোক্‌রাবে মানে হচ্ছে বাইট······তুমি ঠিক এমনি করে টানবে।

হাত তুলে হ্যাঁচকা টান মারা দেখিয়ে দিল পুপ্‌লু। সেলিম মুচকি মুচকি হাসছে।

কিন্তু অ্যালিস ছিপ ফেলায় আর মাছ ঠোকরায় না। একটু ক্ষণের মধ্যে তার ধৈর্য ফুরিয়ে যায়। সে বলে, হোয়াট হ্যাপ্‌ন্ড! হোয়ার দি ফিসেজ্‌ গন্‌?

হাওয়ায় দুলতে দুলতে নৌকোটা বেশী দূরে চলে যাচ্ছে।

এদিকে পুপ্‌লুর মা গল্পের বইটা পড়তে পড়তে হঠাৎ এক সময় চমকে উঠলেন। হাউসবোটটায় কোনো শব্দ নেই কেন? পুপ্‌লু যেখানেই খেলা করুক, খুট্‌খাট্‌ দুপ্‌ দাপ্‌ শব্দ তো কিছু না কিছু হবেই! সাধারণতঃ পুপ্‌লু বসবার ঘরটায় তার খেলনাগুলো ছড়িয়ে বসে।

মা বইটা মুড়ে রেখে চলে এলেন বসবার ঘরে। অন্য ঘরের সাহেব মেমরা সবাই পহলগাঁও বেড়াতে গেছে, তাই পুরো হাউস-বোটটাই এখন ফাঁকা।

বসবার ঘরেও পুপ্‌লুকে না পেয়ে তিনি চলে এলেন সামনের বারান্দায়। তারপর বেশ খানিকটা দূরে তিনি ডিঙ্গি নৌকাটা দেখতে পেয়েই ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন।

ঐটুকু তিনটি ছেলেমেয়ে এক ডিঙ্গি নৌকায়, এক্ষুণি যদি নৌকোটা ডুবে যায়, তা হলে কী হবে? মা ভাবলেন, ওরা আর ফিরতে পারবে না।

তিনি পাগলের মতন চিৎকার করে বলতে লাগলেন, সিদ্দিকী, রহমান, তুম্‌লোক দৌড়ে আও; শিগগির দেখকে যাও। সর্বনাশ হো গিয়া—

সিদ্দিকী আর রহমান এই হাউসবোটের সব কিছু দেখাশুনো করে। ওরা থাকে পাশের একটা ছোট হাউস বোটে। চ্যাচামেচি শুনে ওরা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো।

মা-কে এত ভয় পেতে দেখে ওরা সেলিমকে ডেকে বললো, তক্ষুণি ডিঙ্গি নৌকো এদিকে নিয়ে আসতে।

মা বললেন, ওরা আসতে পারবে না। তোমরা একটা শিকারা নিয়ে যাও, ওঃ উল্টে গেলে কী হবে? আমি ভাবতে পারছি না—

শিকারা মানে জলের ট্যাক্সি। অনেক দূর দিয়ে একটা শিকারা যাচ্ছে, মা হাত তুলে ডাকতে লাগলেন সেটাকে। কিন্তু সেই শিকারাটা আসবার আগেই সেলিমের ডিঙ্গি পৌঁছে গেল।

পুপ্‌লু এক গাল হাসিমুখে বললো, মা, জানো, আমি একটা মাছ ধরেছি। সত্যি, সেলিমকে জিজ্ঞেস করো—। অ্যালিস কিন্তু ধরতে পারে নি!

মা বললেন, উঠে এসো আগে। তারপর তোমায় দেখাচ্ছি মজা!

অ্যালিস পুপ্‌লুর মাকে বললো হেই। হোয়াই উই ওয়্যার শাউটিং লাইক দ্যাট?

ঐটুকু মেয়ের মুখে বকুনির সুর শুনে মা-ও তাকে এক ধমক দিয়ে বললেন, ইউ কিড্‌স আর ভেরি নটি। হোয়াই ডিড ইউ গো ইন সাচ এ স্মল্ বোট।

অ্যালিস এমন দুষ্টু, এই কথা শুনে হেসে উঠলো। তাতে আরও রাগ হয়ে গেল পুপ্‌লুর মা'র।

পুপ্‌লু উঠে এসে বললো, আমার মাছটা? আমার মাছটা আমি নেবো না।

মা বললেন, না! মাছ নিতে হবে না!

পুপ্‌লুকে নিজেদের ঘরে নিয়ে এসে মা বললেন, দুষ্টু ছেলে, তুই কেন আমাকে না বলে নৌকোয় উঠেছিলি?

পুপ্‌লু কাঁচুমাচু মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলো। সে জানে, মা যখন খুব রেগে যান তখন কথা বলে বেশী লাভ নেই। মাকে জব্দ করারও একটা ভালো উপায় পুপ্‌লু জানে। সে নিজে কাঁদতে শুরু করলেই মা'র রাগ সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

বাবা ফিরে আসতেই সবিস্তারে সব ঘটনাটা শোনালেন মা। বাবার ভুরু কুঁচকে গেল। সত্যি চিন্তারই কথা। পুপ্‌লু সাঁতার

জানে না। হাউসবোটে ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়ে থাকার এই একটা ভয়, যদি হঠাৎ ওদের কেউ জলে পড়ে যায়।

বাবা বললেন, চলো তাহলে এই হাউসবোটটা ছেড়ে কালই পহলগাঁও চলে যাই।

প্রথম দিন এসেই বাবার এই হাউসবোটটা পছন্দ হয়নি। প্রথমবার খাবার ঘরে ঢুকতে গিয়েই বাবা 'ওরে বাবরে' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন দারুণ ভয় পেয়ে।

আসলে হয়েছিল কী, একটা ঘরে যে জার্মান ছেলে দুটি আছে, তাদের সঙ্গে রয়েছে একটা কুকুর। কুকুরটা ডবারম্যান জাতের, প্রায় বাঘের মতন চেহারা, চোখ দুটি খুব হিংস্র। সেই কুকুরটা একেবারে বাবার বুকের ওপর দুটো থাবা তুলে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

বাবা এমনিতেই কুকুর পছন্দ করেন না, তার ওপর অত বড় কুকুরকে বুকের ওপর থাবা তুলতে দেখলে তো ভয়ে আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া হবেই। বাবাকে ভয় পেতে দেখে খুব মজা লেগেছিল পুপ্‌লুর। সে কিন্তু অতবড় কুকুর দেখেও একটুও ভয় পায়নি। কুকুরটার গায়ে মাথায় হাত দিয়ে পুপ্‌লু খেলাও করেছে।

কুকুরটার মালিক জার্মান ছেলেটি এসে বাবাকে সেদিন উদ্ধার করে বলেছিল, তোমার কোনো ভয় নেই। আমার এই কুকুর দেড় বছর ট্রেনিং স্কুলে পড়েছে, আমার হুকুম ছাড়া কাউকে কামড়ায় না।

বাবা কিন্তু তবুও কুকুরটাকে দেখলেই ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন।

সেইজন্যই বাবার এই হাউসবোটে থাকার বিশেষ ইচ্ছে নেই।

মা বললেন, কিন্তু এখানে যে আরও তিনদিনের টাকা জমা দেওয়া আছে, তা কি ওরা ফেরৎ দেবে?

বাবা একটু চিন্তা করলেন। টাকা বোধহয় এরা ফেরৎ দেয় না। তাছাড়া পহলগাঁও যেতে হলে আগে থেকে বাসের টিকিট কিনতে হবে। তার জন্য দু' একদিন সময় লাগবে।

বাবা বললেন, টাকা ফেরৎ না দেয় না দিক। চলো, আমরা কয়েকটা দিন কোনো হোটেলে থাকি।

পুপ্‌লুর কিন্তু এই হাউসবোটটাই বেশী পছন্দ। সেলিম আর অ্যালিসের সঙ্গে তার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। তাছাড়া এখান থেকে কতদূর পর্যন্ত দেখা যায়। সারাদিন ধরে দূরের পাহাড়ের রং বদলায় বারবার। সন্ধেবেলা বরফের ওপর রোদ পড়লে ঠিক মনে হয়, সোনার মুকুট।

পুপ্‌লু বললো, না আমরা এখানেই থাকবো ?

বাবা বললেন, শোনো পুপ্‌লু, তুমি এখনো সাঁতার শেখোনি। সাঁতার না জেনে জলের কাছে যাওয়া খুবই বিপজ্জনক! সামনের বছরই তুমি সাঁতার শিখে নেবে।

মা বললেন, কী রে। বল্, আমাদের না জিজ্ঞেস করে তুই আর জলের কাছে যাবি না!

লক্ষ্মী ছেলের মতন ঘাড় নেড়ে পুপ্‌লু বললো, যাবো না।

মা বললেন, উফ্, ভাবলেও এখনো বুক কাঁপছে। যদি নৌকোটা উল্টে যেত ?

সেদিন রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে বাবা আবার বললেন, জানো পুপ্‌লু, কাশ্মীরে এই যে এখন এত হ্রদ দেখছো, অনেক দিন আগে কিন্তু এখানে এত হ্রদ ছিল না। এই যে ডাল লেক, উলার লেক—এসব কিছুই ছিল না। কার জন্য এই সব হ্রদগুলো হয়েছে জানো!

পুপ্‌লু বললো, কার জন্য!

বাবা বললেন, দেবতাদের রাজা ইন্দ্র এইসব করেছেন। এখানে আগে অনেক দৈত্য থাকতো। বাইরে থেকে ভারতবর্ষে ঢোকাই যেত না। দৈত্যদের জয় করবার জন্য ইন্দ্র পাহাড় ফাটিয়ে এখানে এসেছিলেন। ইন্দ্র যুদ্ধে সেই দৈত্যদের হারিয়ে দিলেন, আর সেই যে পাহাড় ফাটিয়ে দিয়েছিলেন, সেই সব জায়গাতেই এই সব হ্রদ তৈরি হলো। কী পুপ্‌লু, ঘুমিয়ে পড়োনি তো।

পুপ্‌লু বললো, না।

বাবা বললেন, সেই দৈত্যরা হেরে গেলেও সবাই কিন্তু মরে যায় নি। এখনো জলের তলায় লুকিয়ে আছে। এই হ্রদের নিচে আছে দৈত্যদের পাথরের বাড়ি। এক একটা বাড়ি রাজপ্রাসাদের মতন!

পুপ্‌লু বললো, সেই বাড়িগুলো তো আমরা দেখতে পাই না?

বাবা বললেন দেখবে কী করে? জলের তলায় কত গাছ, সেই গাছের জন্যে বাড়িগুলো ঢাকা পড়ে গেছে। তুমি যদি একবার জলে পড়ে যাও, অমনি দৈত্যরা তোমার পা ধরে টেনে নিয়ে যাবে, আর তোমাকে উদ্ধার করা যাবে না। বুঝলে?

পুপ্‌লু চুপ।

বাবা আবার জিজ্ঞেস করলেন, ঘুমিয়ে পড়েছো?

পুপ্‌লু শুকনো গলায় বললো, না!

বাবা বললেন, তা হলে বুঝলে তো? খবর্দার, একা একা জলের কাছে কক্ষনো যেও না। একবার দৈত্যদের হাতে পড়লে আর রক্ষে নেই।

পরের দিন দুপুরে মা ইংরেজি উপন্যাসটি পড়তে পড়তে পুপ্‌লুকে শুইয়ে রাখলেন নিজের পাশে। ঠিক দুপুরবেলা ভূতে মারে ঠ্যালা! এই দুপুরটাই সবচেয়ে ভয়ের।

আজও বাবা দুপুরে বেরিয়েছিলেন পহলগাঁও-এর বাসের টিকিট কেটে আনতে। ফিরলেন বিকেলবেলা। পুপ্‌লু একটুও দুষ্টুমী করেনি শুনে বাবা খুব খুশী।

বিকেলবেলা হাউসবোটের কাছে বসে বাবা আর মা চা খান। পুপ্‌লুও ওর খাবার টাবার ছাদে বসেই খেয়ে নেয়।

এই সময় অনেক ফেরিওয়ালা আসে শিকারায় চেপে। কেউ আনে শাল, কেউ আনে কাঠের নানারকম জিনিসপত্র, কেউ আনে ফুল।

এত ফেরিওয়ালা যে তাদের তাড়ানোই খুব শক্ত ব্যাপার। তারা

প্রত্যেকেই একেবারে না-ছোড়বান্দা। অথচ ওদের কাছে জিনিস কিনলেই ঠকতে হয়।

সন্ধের একটু আগে একজন ফেরিওয়ালা একেবারে এলো হাউসবোটের ছাদে।

তার হাতে ছোট্ট একটা বাক্স। সে বেশ বাংলাও জানে। কাশ্মীরে অনেক বাঙালী বেড়াতে যায় তো তাই এরা কাজ চালানো গোছের বাংলাও শিখে নেয়।

বাবা কিছু বলবার আগেই সে বললো, কিনতে হবে না। শুধু দেখে নিন। আমার কাছে ভালো জাতের স্টোন আছে।

বাবা বললেন, স্টোন নিয়ে আমরা কী করবো? দরকার নেই।

ফেরিওয়ালাটি তবু সামনে বসে পড়ে একটা বাক্স খুললো। তারপর একটা ছোট্ট পাথর তুলে নিয়ে বললো, এই দেখুন দিদি, এটা মরকতমণি?

মা অবাক হয়ে বললেন, মরকতমণি? নামই শুনেছি শুধু। চোখে দেখিনি কখনো? এ রকম দেখতে হয় বুঝি?

ফেরিওয়ালাটি বললো, হাঁ, হাতে নিয়ে দেখে নিন্ না। আর এইটা আছে পদ্মরাগ।

বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বুঝলেন যে এই ফেরিওয়ালাটিকে তাড়ানো যাবে না।

মা সেই পাথরটা হাতে নিয়ে বললেন, ভারী সুন্দর তো! এর দাম কত?

ফেরিওয়ালাটি বললে, আগে দেখে নিন না পছন্দ হয় কিনা? দামের জন্যে কী আছে! আপনার ইচ্ছা করলে বিনা পয়সায় নিয়ে যাবেন!

বাবাকেও খুশী করবার জন্য সে বললো, এই দেখুন, সাহেব, কস্তূরী! একদম সাচ্চা জিনিস! হাতে ঘষে দিলে গন্ধ হবে। দিন্, আপনার হাতটা দিন—

ফেরিওয়ালাটি কথাবার্তায় এমন ওস্তাদ যে বাবা আর মা একেবারে মগ্ন হয়ে পড়লেন।

হঠাৎ অনেকগুলো হাউসবোট থেকে অনেক লোক এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো !

মা অমনি ভয় পেয়ে বললেন, পুপ্‌লু কোথায় ? পুপ্‌লু কোথায় গেল ?

বাবা তক্ষুণি উঠে দাঁড়ালেন।

এ দিকে হয়েছে কি, পাথরের ফেরিওয়ালাটি আসবার পরই পুপ্‌লু নেমে গেছে নিচে। হঠাৎ তার ক্যাম্বিস বলটা দেখবার ইচ্ছে হলো।

বলটা ছ'দিন আগেই কেনা হয়েছে। বাবা বলেছেন, পহলগাঁও গিয়ে বরফের ওপর এই বলটা দিয়ে খেলা হবে। তার আগে, এখানে জলের মধ্যে বলটা বার করবার দরকার নেই।

পুপ্‌লু তবু বলটা মাঝে মাঝে দেখে। ছ'একবার ড্রপ খাওয়ায়। বলটা সাদা ধপ্‌ধপে।

হাউসবোটের ছাদ থেকে নিচে নেমে এসে পুপ্‌লু বলটা ছ'একবার ড্রপ খাওয়াতেই সেটা বড্ড বেশী লাফিয়ে একেবারে জলে গিয়ে পড়লো।

পুপ্‌লু ভয় পেয়ে গেল খুব। বলটা হারিয়ে ফেললে বাবা বকবেন নিশ্চয়ই।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পুপ্‌লু ফিস্‌ফিস্ করে ডাকলো, সেলিম ! সেলিম !

সেলিমকে পাওয়া গেল না। সেলিম থাকলে বলটা উদ্ধার করে দিতে পারতো।

'স্টার অফ ইণ্ডিয়া' হাউস বোটের বারান্দা থেকে অ্যালিস বললো, হেই, পুপ্‌লু, ইয়োর বল্···ওভার দেয়ার···

পুপ্‌লু ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললো, চুপ ?

সেলিমের ডঙ্গি নৌকোটা পাশেই বাঁধা আছে। ঐ নৌকোটায় উঠে হাত বাড়ালেই বল্‌টা পাওয়া যাবে।

পুপ্‌লু ভাবলো টক্‌ করে একবার নৌকোটায় উঠে বলটা তুলে আনলেই বাবা-মা কিছুই বুঝতে পারবেন না। নৌকোটা তো বাঁধা আছেই।

বেশী সময় নষ্ট হলে বল্‌টা বেশী দূরে চলে যাবে। পুপ্‌লু সিঁড়ি দিয়ে নেমে উঠে পড়লো ছোট্ট ডিঙ্গি নৌকোটায়!

নৌকোটা আসলে বাঁধা ছিল না। একটা দড়ি শুধু জড়ানো ছিল একটা কাঠের সঙ্গে। পুপ্‌লু নামতেই তো দড়িটা খুলে গেল।

এবার সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে গেল পুপ্‌লু। বল্‌টা ধরবার জন্য হাত বাড়াতেই সেটা চলে গেল আর একটু দূরে। নৌকোটাও দুলে উঠলো।

এখন কী হবে? নৌকো তো সে চালাতে পারবে না! ইস্‌ সেলিমটা যে গেল কোথায়!

অ্যালিস চেঁচিয়ে বললো, হেই, ইউ আর টেকিং দা বোট···অল বাই ইয়োর সেল্‌ফ? কাম হিয়ার···

নৌকোটা আর একটু দূরে সরে যেতেই সিদ্দিকী ও আরও কয়েকজন দেখতে পেয়ে গেল তাকে। বিপদটা বুঝতে পেরেই তারা চেঁচিয়ে উঠেছে।

হাউসবোটের ছাদের ওপর থেকে বাবা দেখতে পেলেন পুপ্‌লুকে। পুপ্‌লুও দেখতে পেয়েছে বাবাকে।

ঘাবড়ে গিয়ে বাবা বলে ডেকে উঠে পুপ্‌লু যেই বসে পড়তে গেল, অমনি উল্টে গেল নৌকোটা।

পুপ্‌লুকে আর দেখা গেল না।

বাবা এক ঝট্‌কায় কোটটা খুলে ফেলতে গেলেন। তিনি ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়বেন বলে।

ফেরিওয়ালাটি সঙ্গে সঙ্গে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো বাবাকে।

বাবা অবাক হয়ে বললেন, ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও!

ফেরিওয়ালাটি বললো, বাবুজী, কী করছেন! এখান থেকে লাফালে আপনি বাঁচবেন না! দাঁড়ান!

মা ভয়ে বিস্ময়ে এতই অবাক হয়ে গেছেন যে কোনো কথা বলতে পারছেন না।

সিদ্দিকী আরও দু'জন ততক্ষণে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

কিন্তু তারই আগে একটা শিকারা খুব জোরে ছুটে এলো উল্টোনো ডিঙ্গি নৌকোটার কাছে।

মাছরাঙা পাখি যেমন জলের মধ্যে ছোঁ মেরে মাছ ধরে উঠে আসে, ঠিক সেই রকম ভাবেই শিকারা থেকে একজন লোক জলে লাফিয়ে পড়ে প্রায় চোখের নিমেষেই তুলে আনালো পুপ্‌লুকে।

ঠাণ্ডা জলে ডুবে যাওয়ায় পুপ্‌লুর মুখখানা নীল হয়ে গেছে। চোখ দুটি বোজা। যে লোকটি পুপ্‌লুকে উদ্ধার করে এনেছে সে বললো, ও কই ডর নেই, বাবুসাব। ঠিক হো জায়গা।

মা পুপ্‌লুকে কোলে নিয়ে বসে রইলেন। বাবা তাড়াতাড়ি খানিকটা ব্র্যাণ্ডি যোগাড় করে ঢেলে দিলেন পুপ্‌লুর মুখে।

একটু বাদেই পুপ্‌লুর জ্ঞান ফিরলো।

তাতেও মা আর বাবা নিশ্চিন্ত হলেন না। অত ঠাণ্ডা জলে ডুবে গিয়েছিল। যদি কঠিন কোনো অসুখ হয়!

সাহেবদের মধ্যে একজন ডাক্তার। তিনি পুপ্‌লুকে দেখে বললেন, না, কোনো ভয়ের কারণ নেই।

কাছাকাছি অনেকগুলো হাউস বোট থেকে অনেকে এল পুপ্‌লুকে দেখতে। কিন্তু সন্ধের পরই পুপ্‌লু একেবারে ভালো হয়ে গেল। লাফালাফি করে খেলতে গেল অ্যালিসদের হাউস বোটে।

সেদিন রাতে শুয়ে পড়বার পর তার বাবা কিছুক্ষণ আলো জ্বেলে বই পড়লেন। মা আগেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। অনেক রাত, চারিদিক নিস্তব্ধ।

এর মধ্যে পুপ্‌লু বললো, বাবা জানো তো, জলের তলায় কী দেখলুম ?

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কী ?

পুপ্‌লু বললো, সেই দৈত্যদের বাড়ি দেখলুম। গাছপালার আড়ালে মস্ত বড় বাড়ি !

বাবা বললেন, তাই নাকি ?

পুপ্‌লু বললো, হ্যাঁ। সেই দৈত্যগুলো মোটেই খারাপ নয়, বেশ ভালো। আমায় দেখে বললো, এই যে এসো, এসো ! সেখানে একজন রাজকন্যাও রয়েছে, ঠিক আমার সমান। বাংলায় কথা বলতে পারে······আমায় দেখে বললো, তুমি কলকাতার পুপ্‌লু না ? তুমি থাকবে আমাদের বাড়িতে। বাবা তোমরা তো কেউ দেখোনি। আমি কী রকম জলের তলায় দৈত্যদের দেশ দেখে এলুম। বাবা, তুমি ঘুমিয়ে পড়লে ?

বাবা হো হো করে হেসে উঠলেন।

ডাকাতের পাল্লায়

ভুটানে বেড়াতে গিয়ে একদিনও খবরের কাগজ পড়িনি। পাহাড়, নদী আর আকাশ দেখেই চোখ ভরে থাকতো। ছাপা অক্ষর পড়ার কাজ থেকে চোখ দুটোকে ছুটি দিয়েছিলাম।

তারপর একদিন ভুটান থেকে আমরা নেমে এলাম সমতলে। উঠলাম গিয়ে বরাডাবরি বাংলোয়। সেখানে আর দু'দিন কাটিয়ে তারপর কলকাতায় ফেরা।

সেই বাংলোয় বসবার ঘরে দেখলাম একটা খবরের কাগজ পড়ে আছে। অমনি পুরোনো অভ্যেসটা মাথা নাড়া দিয়ে উঠলো। টেনে নিলাম কাগজটা।

তাতে একটা খবর দেখে চমকে উঠলাম। সেবক রোডে গত এক সপ্তাহের মধ্যে তিনবার ডাকাতি হয়ে গেছে!

বাংলোর চৌকিদার কাছেই ছিল। তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি শুনেছো ডাকাতির কথা?

সে চোখ বড় বড় করে বললো, ওরে বাবা, সে কথা আর বলবেন না, সাহেব! সন্ধের পর আজকাল আর কেউ রাস্তায় বেরোতেই চায় না। একে তো এদিকে রয়েছে পাগলা হাতির উপদ্রব, তার ওপর শুরু হয়েছে ডাকাতদের হামলা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী করে এই ডাকাতরা?

চৌকিদার বললো, এরা কোথা দিয়ে যে কখন আসবে, তা বোঝার উপায় নেই। এরা লুকিয়ে থাকে জঙ্গলের মধ্যে। রাত্তিরবেলা হঠাৎ বড় রাস্তার ওপর একটা মোটা গাছের গুঁড়ি ফেলে গাড়ি আটকে দেয়। তারপর তিন চার জন বন্দুক হাতে নিয়ে গাড়িটাকে ঘিরে

ফেলে। তারপর সব লুটপাট করে নিয়ে চলে যায়। কেউ বাধা দিতে এলে গুলি করে মেরে ফেলে। এ পর্যন্ত দুটো গাড়ির ড্রাইভারকে মেরেছে। পুলিশ এদের কিছুতেই ধরতে পারছে না।

খবরের কাগজেও দেখলাম, প্রায় ঐ এক কথাই লিখেছে। তবে, দুটো গাড়ির ড্রাইভারকে মেরে ফেলার কথাটা সঠিক নয়, তারা আহত হয়ে হাসপাতালে আছে। আর একটা গাড়িতে তারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল।

ডাকাতরা সংখ্যায় মাত্র তিন চার জন। ছোট ছেলেদের যেমন খেলবার মুখোস পাওয়া যায়, তারা সেই রকম মুখোস পরে থাকে। পুলিশ এখনো কোন খোঁজ পায় নি।

আমি খবরের কাগজটা টেবিলের তলায় লুকিয়ে ফেললাম। ঝর্না মাসী দেখে ফেললে আবার মুস্কিল হবে। কারণ, আমাদের ফিরতে হবে ঐ সেবক রোড দিয়েই।

কিন্তু ঝর্না মাসীর ছেলে বুবুন শুনে ফেলেছিল আমার আর চৌকিদারের কথাবার্তা। সে খাবারের টেবিলে হঠাৎ বলে ফেললো, মা, আজ সন্ধেবেলা ডাকাত দেখতে যাবে? এখানে রোজ মুখোস পরা ডাকাত বেরোয়?

আর চেপে রাখা গেল না। ডাকাতদেয় কথা এসে পড়লোই। মেসোমশাই বললেন, আমিও শুনছি, খুব ডাকাতি হচ্ছে এদিকে। গেটের সামনে কয়েকজন লোক বলাবলি করছিল। পরশুদিনও নাকি তিস্তা ব্রীজ পেরিয়ে মাইল খানেক দূরে সেবক রোডের ওপর একটা ডাকাতি হয়েছে।

ঝর্না মাসী বললেন, তাহলে আমরা কুচবিহার দিয়ে যাবো!

মেসোমশাই বললেন, কেন?

ঝর্না মাসী বললেন, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন যেতে হলে সন্ধের পর ঐ সেবক রোড দিয়ে যেতে হবে। তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে? সঙ্গে এত জিনিস পত্তর।

এই রে, ঝর্না মাসী একবার গোঁ ধরলেই মুস্কিল! কুচবিহার দিয়ে যাওয়া মানে এক ঝামেলা। অনেক সময় লেগে যাবে। আর এ দিক দিয়ে নিউ জলপাইগুড়িতে গিয়ে দার্জিলিং মেল ধরলে আমরা পরদিন ভোরেই কলকাতায় পৌঁছে যাবো!

বুবুন বললো, 'না, মা, আমরা ঐ ডাকাতের রাস্তা দিয়ে যাবো। আমরা ডাকাত দেখবো!'

ঝর্না মাসী এক ধমক দিয়ে বললেন, 'চুপ কর্ তো! বড় দুষ্টু হচ্ছিস দিন দিন।'

কাছাকাছি একটা চা বাগানের ম্যানেজার মেসোমশাইয়ের বন্ধু। পরদিন দুপুরে আমরা নেমতন্ন খেতে গেলুম তাঁর বাংলোয়।

কথায় কথায় ডাকাতের প্রসঙ্গ উঠলো।

ম্যানেজারের নাম অজয়বাবু। তিনি বললে, আপনারাও ডাকাতের কথা শুনে ভয় পেয়েছেন নাকি?

ঝর্না মাসী বললেন, 'ভয় পাবো না? ডাকাতদের কে না ভয় পায়!'

বুবুন বললো, 'আমি ভয় পাই না!'

অজয়বাবু বুবুনের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'এই তো চাই!'

তারপর তিনি ঝর্না মাসীর দিকে ফিরে বললেন, 'বাঘ, হাতি আর ডাকাতদের নিয়ে আমাদের থাকতে হয়। আমাদের কী আর ওসবে ভয় পেলে চলে?'

মেসোমশাই জিজ্ঞেস করলেন, 'আমরা আজ ঐ রাস্তা দিয়ে গিয়ে দার্জিলিং মেল ধরবো ভেবেছিলাম, কিন্তু চিন্তা হচ্ছে।'

অজয়বাবু বললেন, 'চিন্তার কী আছে? আমার জিপ গাড়িটা দিয়ে দিচ্ছি, আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসবে। যদি ডাকাতরা আসেও জিপ গাড়ি দেখলেই ভাববে পুলিশের গাড়ি, অমনি পালাবে! যদি চান তো আমার বন্দুকটাও দিয়ে দিতে পারি সঙ্গে!'

বুবুন বললো, হ্যাঁ, বন্দুকটা চাই? 'ডাকাত এলেই গুড়ুম গুড়ুম করে গুলি করে দেবো!'

ঝর্না মাসী বললেন, 'বন্দুক তো দেবেন, কিন্তু সেটা চালাবে কে?'

অজয়বাবু আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, কেন, আপনারা কেউ জানেন না?

আমি লজ্জা পেয়ে মাথা নাড়লাম, কোনোদিন আমি একটা সত্যিকারের বন্দুক হাতে নিয়েই দেখিনি। মেসোমশাই নাকি এক কালে শিকার করতেন। কিন্তু ঝর্না মাসী সে কথা বিশ্বাস করেন না। সুতরাং মেসোমশাইও চুপ করে রইলেন।

অজয়বাবু বললেন, সে দরকার পড়লে আমার ড্রাইভারই বন্দুক চালাতে পারবে। দরকার হবে না অবশ্য···আমি নিজেই আপনাদের পৌঁছে দিতাম, কিন্তু আমার আবার একটা বিশেষ কাজ আছে·····

বিকেল থাকতে থাকতেই আমরা জিপ গাড়িতে মালপত্র চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ঝর্না মাসী বললেন, না হয় বেশীক্ষণ স্টেশনে বসে থাকবো, কিন্তু সন্ধের পর ঐ রাস্তা দিয়ে যাবার দরকার নেই।

রাস্তাটা কিন্তু চমৎকার। দু'পাশে চা বাগান, মাঝখান দিয়ে রাস্তাটা গেছে এঁকে বেঁকে। সমতল ভূমি ছাড়িয়ে এক সময় পাহাড়ের গা দিয়ে যেতে হয়। তারপর তিস্তা নদীর ওপর করোনেশান ব্রীজ। এমন সুন্দর জায়গা খুব কমই আছে। বিরাট চওড়া এখানে তিস্তা নদী, ঠিক যেন রূপোগলা জল। ব্রীজ পেরিয়ে ডান দিকে গেলে কালিম্পং-এর রাস্তা। আমরা যাবো ডান দিকে।

বিকেল শেষ হয়েছে, হঠাৎ ঝুপ ঝুপ করে অন্ধকার নেমে এলো। এসব পাহাড়ী জায়গায় আস্তে আস্তে সন্ধে নামে না। যাই হোক আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাবো।

সারাটা রাস্তা বুবুন ব্যাকুল ভাবে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থেকেছে। তার খুব আশা ছিল যে-কোনো মুহূর্তে পাশের জঙ্গল থেকে একপাল হাতি কিংবা একদল ডাকাত বেরিয়ে আসবে! কিন্তু সে রকম রোমাঞ্চকর কিছুই ঘটলো না।

আমাকে সে বারবার জিজ্ঞেস করছিল, ও নীলুদা, বলো না, ডাকাতদের কী রকম দেখতে হয় ?

ওর ধারণা, ডাকাত বুঝি ভূত বা দৈত্যের মতন আলাদা ধরনের কিছু !

আমি উত্তর দিয়েছিলাম, বড় বড় কান, চোখ দুটো দিয়ে আগুন জ্বলে, ডাকাতদের হাতে নোখও থাকে খুব বড় বড়···

পাহাড়টা সবে পার হয়ে আমরা সমতল রাস্তায় এসেছি, এমন সময় ঘ্যাস্ স ঘ্যাস্ স আওয়াজ করে আমাদের জিপ গাড়িটা থেমে গেল।

ঝর্না মাসী আঁতকে উঠে বললেন, 'কী হলো ? কী হলো ?'

ড্রাইভারটি নেপালী এবং খুব গম্ভীর। সে কোনো কথা না বলে নেমে গিয়ে গাড়ির বনেট খুললো। তারপর খুট খাট করতে লাগলো অনেকক্ষণ ধরে।

ঝর্না মাসী বললেন, কী হলো, এই নীলু, নেমে ছাখ না !

বাইরে শীতের ফিনফিনে হাওয়া, তাই নামতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু আর না নেমে উপায় নেই। ড্রাইভারটির পাশে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেয়া হুয়া। কতক্ষণ বাদ সে চলে গা ?

ড্রাইভার খুব সংক্ষেপে উত্তর দিল, নেই চলে গা !

—অ্যাঁ ?

ততক্ষণে মেসোমশাইও এসেছেন, আমার চেয়ে গাড়ির যন্ত্রপাতির ব্যাপার তিনি ভালো বোঝেন। তিনি ভালো করে দেখে বললেন, কী সাজ্ঘাতিক ব্যাপার !

গাড়ির রেডিয়েটার ফুটো হয়ে সব জল পড়ে গেছে রাস্তায়। আর ফ্যান বেল্টও ছিঁড়ে গেছে। এখন এই গাড়ি চালাবার আর কোনো উপায়ই নেই।

ছোট মাসী সে খবর শুনে দারুণ রেগে গিয়ে বললেন, তোমার ঐ অজয়বাবুটার কী আক্কেল ? এরকম একটা পচা গাড়ি দিয়ে আমাদের পাঠিয়েছে।

মেসোমশাই বন্ধুর সমর্থনে দুর্বলভাবে বললেন, আহা, যন্ত্রপাতির কথা কি বলা যায়ঃ কখন কোন্‌টা খারাপ হয়!

এখন কী উপায়?

মেসোমশাই ছোট মাসীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, এদিক থেকে আরও গাড়ি যাবে তো, তাদের কাউকে বললে আমাদের নিয়ে যাবে নিশ্চয়ই!

ঝর্না মাসী জিজ্ঞেস করলেন, এখানে ট্যাক্সি পাওয়া যায় না।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, এখানে জঙ্গলের মধ্যে কে তোমার জন্য ট্যাক্সি নিয়ে বসে থাকবে?

ঝর্না মাসী আমাকে এক ধমক দিয়ে বললেন, তুই আবার হাসছিস? তোর লজ্জা করছে না; তখনই আমি বলেছিলাম কুচবিহার দিয়ে যেতে—

এ রাস্তায় গাড়ি চলাচল সত্যি খুব কমে গেছে। অন্য সময় লরি আর প্রাইভেট গাড়ি যায়। কিন্তু দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে একটাও গাড়ি এলো না। সবাই কি ডাকাতের ভয় পেয়েছে? লরি তো কখনো বন্ধ হয় না। অন্তত একটা পুলিশের গাড়ি এলেও তো পারতো!

প্রায় পনেরো মিনিট বাদে দূরে একটা গাড়ির হেডলাইট দেখা গেল। একটু কাছে আসতে দেখা গেল, ট্রাক। একটা নয়, পরপর তিনটে। আমরা হল্লা করতে লাগলাম, এই, থামো থামো, আমাদের গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে, থামো!

তারা তো থামলোই না, বরং যেন আরও স্পীড বাড়িয়ে হুস করে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর আবার দুটো ট্রাক এলো পরপর। এবার আমরা আরও জোর চ্যাঁচালাম, এবারও তারা না থেমে চলে গেলো একই ভাবে।

আবার অনেকক্ষণ বাদে একটা গাড়ির আলো যেই দেখলাম,

অমনি আমরা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেলাম তিনজন। ছ'হাত তুলে চ্যাচাতে লাগলাম। আর যাই হোক, আমাদের তো চাপা দিতে পারবে না !

প্রায় চাপাই দিচ্ছিল আর একটু হলে। শেষ মুহূর্তে আমরা লাফিয়ে পড়লাম রাস্তার পাশে, ট্রাকটাও ব্রেক কষলো। আমি দৌড়ে ড্রাইভারের জানলার কাছে গিয়ে বললাম, বহুৎ বিপদে পড়া হ্যায়···হাম লোককো ট্রেন পাকড়ানে হোগা, গাড়ি খারাপ হুয়া···

আমি কথা শেষ করতে পারলাম না। গাড়ির ভেতর থেকে একটা হাত বেরিয়ে এসে আমার মুখে একটা ধাক্কা দিল খুব জোরে। আমি ছিটকে পড়লাম রাস্তার মাঝখানে। গাড়িটাও এর মধ্যে স্টার্ট নিয়ে জোরে বেরিয়ে গেল।

ঝর্না মাসী বললেন, কী পাজী, কী শয়তান ওরা ! নীলু, তোর বেশী লাগেনি তো ?

ধুলো ঝেড়ে উঠে এসে আমি বললাম, একটা জিনিস বোঝা গেল, কোনো গাড়ি আমাদের নিয়ে যাবে না। দিন-কাল খারাপ বলে অচেনা লোককে কেউ তুলতে চাইছে না।

এবার মেসোমশাইয়ের মুখটা কালো হয়ে এলো। কোনো গাড়ি যদি আমাদের না নিয়ে যায়, তা হলে কী উপায় হবে ? জিপটাকে আজ রাত্তিরের মধ্যে চালাবার কোনো উপায়ই নেই। সারা রাত কি তাহলে আমরা পথের পাশে বসে থাকবো ?

ছ'পাশে ঘন জঙ্গল। রাত্তিরবেলা অন্ধকার জঙ্গল দেখলেই গা ছমছম করে। এদিকে বাঘের উপদ্রব বিশেষ নেই। অবশ্য ছ' একটা বাঘ ছিটকে চলেও আসতে পারে। আর আসতে পারে হাতি। অনেক সময়ই এই সব জঙ্গল থেকে হাতি বেরিয়ে এসে রাস্তা পার হয়। কিছুদিন আগেই আমরা জয়ন্তিয়ার কাছে দেখেছি যে হাতির দঙ্গল এলেই সেখানে একটা আধটা বন্দুক থেকেও বিশেষ লাভ নেই।

তাদের খেয়াল হলে তারা আমাদের সবাইকে পায়ের তলায় পিষে চিঁড়ে চ্যাপ্টা করে দিয়ে যেতে পারে !

এছাড়া ডাকাতের ভয় তো আছেই। সারা রাত আমাদের এখানে ডাকাতের ভয় নিয়ে বসে থাকতে হবে।

তার চেয়েও বড় ভয় শীত। সারা-রাত যদি জিপের মধ্যে বসে থাকতে হয় তা হলে আমরা ঠাণ্ডায় জমে যাবো একেবারে। বাঘ, হাতি আর ডাকাতের ভয় নিয়ে এই দারুণ শীতের রাত কাটানো প্রায় এক অসম্ভব ব্যাপার।

অথচ আর কী-ই বা করার আছে ?

মেসোমশাই ঘড়ি দেখলেন। আর ঠিক এক ঘণ্টা বাদে দার্জিলিং মেল ছেড়ে যাবে। অথচ সেখানে পৌঁছোবার কোনো উপায়ই নেই। হঠাৎ তিনি খুব রেগে গিয়ে নেপালী ড্রাইভারটিকে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললেন, কাঁহে এইসা খারাপ গাড়ী লেকে আয়া ?

সে বললো, হাম্ কেয়া করেগা সাব !

জঙ্গলে কিছু একটা আওয়াজ হলেও আমরা চমকে উঠছি।

শুকনো পাতার খস খস শব্দ, কে যেন হেঁটে আসছে! একটু পরেই শব্দটা থেমে গেল। সেদিকে টর্চ ফেলেও আর কিছু দেখা গেল না। কেউ কি লুকিয়ে আমাদের লক্ষ্য করছে ?

ঝর্না মাসীও এখন আমাদের বকুনি দিতে ভুলে গেছেন।

বুবুন আমার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে আছে। মেসোমশাই ঘন ঘন সিগারেট ধরাচ্ছেন!

হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় উল্টো দিকের জঙ্গলের মধ্যে একটা গাছের ডাল মড় মড় করে ভেঙে পড়লো। আমরা চমকে লাফিয়ে উঠলাম প্রায়।

আমি আর মেসোমশাই পরস্পরের মুখের দিকে চাইলাম। এই রকমভাবে কাটাতে হবে সারা রাত ? এরকম চমকে চমকে ? অথচ অন্য কী যে করা যায়, ভেবেই পাচ্ছি না।

এই সময় উল্টো দিকের রাস্তায় একটা হেড লাইটের আলো দেখা গেল। আমার বুকটা ধক্ করে উঠলো। কিন্তু কোনো লাভ নেই। আমরা যেদিকে যাবো, গাড়িটা আসছে সেই দিক থেকেই। জোরালো আলো দেখেই বোঝা যায়, ওটাও একটা ট্রাক।

নেপালী ড্রাইভারটি হঠাৎ বললো, সাব, ট্রাক রোকে গা ?

মেসোমশাই বললেন, ট্রাক থামাবে ? কী করে ?

সে সাদা দাঁতের ঝিলিক দেখিয়ে হাসলো। তারপর দৌড়ে গিয়ে জিপ থেকে নিয়ে এলো বন্দুকটা। তারপর সে আর একটা কাজ করলো। পকেট থেকে একটা সাদা রুমাল বার করে সেটা বেঁধে ফেললো মুখে। অমনি তার মুখখানা হয়ে গেল মুখোসের মতন।

সে আমাকে বললো, সাব, আপ ভি হামারা সাথ আইয়ে !

তার কোমরে একটা ভোজালি ছিল। সেটা খুলে সে আমার হাতে দিল। তারপর ইঙ্গিতে বোঝালো, আমারও মুখে একটা রুমাল বেঁধে নিতে।

মেসোমশাই উত্তেজিত ভাবে আবার ঘড়ি দেখে বললেন, দ্যাখো যদি ট্রাকটা থামাতে পারো, তা হলে এখনো দার্জিলিং মেল ধরা যেতে পারে !

আমি আর নেপালী ড্রাইভারটি গিয়ে দাঁড়ালাম রাস্তার মাঝখানে। মেসোমশাই তখন ঝর্না মাসী আর বুবুনকে নিয়ে জিপের আড়ালে গিয়ে লুকোলেন।

হেডলাইটের আলো ঠিক যখন আমাদের মুখে এসে পড়েছে, সেই সময় নেপালী ড্রাইভারটি বন্দুকের মুখ আকাশের দিকে তুলে গুড়ুম করে একটা গুলি চালালো ! আমার বুক ঢিপ ঢিপ করছে। ট্রাকটা যদি না থেমে আমাদের চাপা দিতে আসে তাহলে মুহূর্তে পাশের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য আমি তৈরি হয়ে ছিলাম।

কিন্তু ট্রাকটা থেমে গেল।

নেপালী ড্রাইভারটি সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক উঁচিয়ে ড্রাইভারের কাছে ছুটে গিয়ে বললো, রুক যাও? নেহি তো খতম কর দেগা!

আমি অন্যদিকের জানালায় লাফিয়ে উঠে ভোজালি দেখিয়ে বললাম, খবরদার!

ট্রাকের ড্রাইভার ভয় পেয়ে বললো মারিয়ে মাৎ! মারিয়ে মাৎ!

আমি আবার নেমে পড়ে চলে গেলাম ট্রাকের পেছন দিকে। সেখানে প্রচুর মালপত্র রইলেও খানিকটা জায়গা খালি আছে। জিপ থেকে আমাদের মালপত্রগুলো এনে ছুঁড়ে দিলাম সেখানে। তারপর ঝর্না মাসী আর বুবুনকে টেনে হিঁচড়ে তুলে দিলাম ওপরে। মেসোমশাইও গিয়ে বসলেন ওদের পাশে।

আমি আবার ড্রাইভারের জানলার পাশে লাফিয়ে উঠে বললাম, গাড়ি ঘুমাও!

নেপালী ড্রাইভারটিও বন্দুকটা ড্রাইভারের কপালে ঠেকিয়ে বললো, আভি গাড়ি ঘুমাও!

ড্রাইভারের পাশে একজন শুধু ক্লিনার বসে ছিল। সে বেচারী একেবারে ভয়ে কুঁকড়ে গেছে। আমি তার গায়ে খোঁচা মেরে বললাম, এই হাট্‌কে বৈঠো না।

ড্রাইভার ট্রাকটা ঘোরালো খুব অনিচ্ছার সঙ্গে। কিন্তু তার আপত্তি করবার উপায় নেই, কারণ কানের পাশেই বন্দুকের নল।

গাড়ি ঘোরাবার পর আমি বললাম, জোরসে চালাও!

বাইরে বেশ কনকনে হাওয়া বলে আমি ভেতরে এসে বসলাম ভোজালি উঁচিয়ে। নেপালী ড্রাইভার বাইরেই রইলো, নইলে বন্দুকটা তাক করা যাবে না! আমার খুব সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু উপায় নেই, তা হলে মুখ থেকে রুমালটা খুলতে হয়।

এখনো জোরে গেলে ট্রেনটা ধরতে পারি। চল্লিশ মিনিট সময় আছে। আমি ভোজালিটা একবার ড্রাইভারের চোখের সামনে ঘুরিয়ে বললাম, জোরসে চালাও! আউর বহুৎ জোর।

নেপালী ড্রাইভারটিও বন্দুকের খোঁচা মেরে বললো, বহুৎ জোরসে!

ট্রাক ড্রাইভার ভাবলো, আমরা বুঝি পুরো ট্রাকটাই লুট করতে চলেছি।

দুর্দান্ত জোরে ছুটলো। প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই দূরে দেখা গেল শহরের আলো। সে এবার একটু একটু টেরিয়ে আমাদের দিকে তাকালো। যেন সে অবাক হয়ে ভাবছে, শহরের মধ্য দিয়ে আমরা যাবো কী করে?

সে হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেই তো আমরা ধরা পড়ে যাবো!

আমি আবার বললাম, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন চলো! জোরসে। বহুৎ জোরসে।

সে বললো, কেয়া? রেল স্টেশন?

আমি এবার হো হো করে হেসে উঠলাম। মুখের রুমালটা খুলে ফেললাম। নেপালীটিও বন্দুক নামিয়ে বললো, স্টেশান আ গয়া?

সেদিন ট্রাক ড্রাইভারটি ডাকাতের পাল্লায় পড়লেও শেষ পর্যন্ত মেসোমশাইয়ের কাছ থেকে একশো টাকা বখশিস পেয়েছিল অবশ্য।

ডাকাতের দল আর গুরুদেব

বছর দশেক আগেও বেলঘোরিয়ার একটা জায়গায় ছিল বড় বড় ডাকাতদের আড্ডা। দিনের বেলা রাস্তার ওপর মানুষ খুন, ব্যাঙ্ক ডাকাতি কিংবা চলন্ত ট্রেনের যাত্রীদের সব টাকা পয়সা কেড়ে নিয়ে চলন্ত ট্রেন থেকেই লাফিয়ে পড়া এই বেলঘোরিয়ার ডাকাতদের পক্ষে ছিল অতি সহজ কাজ। কলকাতা কিংবা অন্য জায়গায় নাম করা সব বড় বড় ডাকাতরাও লুকিয়ে থাকতো বেলঘোরিয়ার সেই গোপন জায়গাটায়।

পুলিশ অনেকবার সেখানে হানা দিয়েছে। বেশ কয়েকবার পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধও হয়েছে ডাকাতদের। দারুণ সাহস সেই ডাকাতদের, তাদের সঙ্গে থাকতো স্টেনগান, মেশিন গান আরও সব সাঙ্ঘাতিক অস্ত্র। তু'তিনবার পুলিশরাই হেরে গিয়ে ফিরে এসেছে। একবার ডাকাতদের গুলিতে তিনজন পুলিশ মারা যায় তাদের মধ্যে একজন আবার বড় অফিসার। তার পরের দিন পুলিশের একটি বিরাট দল জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে ডাকাতদের গোপন আড্ডাখানাটা একেবারে ঘিরে ফেলে। সেবার পাঁচজন ডাকাত ধরা পড়েছিল আর তু'জন ডাকাত আহত হয়ে হাসপাতালে গিয়ে মরে গিয়েছিল। কিন্তু তা বলে বেলঘোরিয়ার ডাকাতরা দমে যায় নি। ঐ ঘটনার ঠিক দশ দিন বাদেই তুপুরবেলা একদল ডাকাত বেলঘোরিয়া রেল স্টেশনে ঢুকে সব টাকা লুট করে নেয়। যাবার সময় তারা সমস্ত রেল-কর্মচারীদের হাত পা বেঁধে রেখে গিয়েছিল। ডাকাতরা যেন বুঝিয়ে দিতে এসেছিল যে পুলিশকে তারা ভয় পায় না।

তাদের অবশ্য ডাকাত বলা হতো না, বলা হত গুণ্ডা।

বেলঘোরিয়ার গুণ্ডাদের নাম সবাই শুনেছে। কিন্তু যারা টাকা লুট করে কিংবা মানুষ খুন করে, তাদের গুণ্ডা না বলে ডাকাত বলাই তো ঠিক।

বেলঘোরিয়ার ডাকাতদের সম্পর্কে একটা অদ্ভুত ঘটনাও জানতো অনেকে। ঐ ডাকাতরা পুলিশকে ভয় পায় না বটে, কিন্তু একজন মানুষকে ভয় পায়। সেই মানুষটির নাম গুরুদেব। সেই গুরুদেবকে অবশ্য বেলঘোরিয়ার অন্য কোনো লোক কিংবা পুলিশের লোকেরা চোখে দেখেনি কখনো।

যে-সব ডাকাতরা পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল, তাদের অনেক জেরা করা হয়েছিল এই গুরুদেব সম্পর্কে। তারা কিছুতেই মুখ খোলে নি। গুরুদেবের নাম উচ্চারণ করলেই তারা কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতো!

পুলিশের অনেক বড় বড় অফিসার অবশ্য বলতেন, এই গুরুদেবের ব্যাপারটা একদম বাজে কথা। ওরকম কোনো লোক নেই। এত বাঘা বাঘা ডাকাতরা শুধু একজন লোককে ভয় পায়, তা কখনো হতে পারে? কোথায় সে থাকে, কী করে? অন্য কেউ তাকে দেখেনি কেন?

এই সময় ধনা হালদার নামে দারুণ কুখ্যাত একজন ডাকাত নিজে থেকে এসে পুলিশের কাছে ধরা দেয়। ধনা হালদার এমনই দুর্দান্ত যে পুলিশ তাকে কিছুতেই ধরতেই পারে নি, সে কত যে মানুষ খুন করেছে আর কতবার যে ট্রেন-ডাকাতি করেছে তার ঠিক নেই। সেই ধনা একদিন দুপুরবেলা নিজে থেকে লালবাজারে পুলিশ কমিশনারের অফিসে এসে বললো, আমার নাম ধনা হালদার, আমায় গ্রেফ্‌তার করুন।

পুলিশের কাছে ধনার ছবি ছিল, তাকে চিনতে একটুও অসুবিধে হলো না। সবাই অবাক।

ধনা কেন ধরা দিল? সে বলেছিল, গুরুদেবের আদেশ।

তখন ধনাকেও গুরুদেব সম্পর্কে অনেক জেরা করা হলো। কিন্তু সে আর কোনো কিছু বলতে চায় নি। সে শুধু বারবার বলেছিল, আমায় ফাঁসী দিন কিংবা যা খুশী করুন, গুরুদেবের আদেশে আমি এখানে এসেছি!

সেবারেও পুলিশের অনেক বড় অফিসার বলেছিলেন, ঐ গুরুদেবের কথাটা ধাপ্পা! ধনা হালদার ধরা দিয়েছে অন্য কারণে। গুণ্ডাদের মধ্যেও অনেক দল থাকে, আর এক দলের সঙ্গে অন্য দলের প্রায়ই দারুণ মারামারি হয়। ধনা হালদার একদিন রাগের মাথায় অন্য একটা দলের সর্দার মেঘা দাসের গলার নলি কেটে ফেলে। মেঘা দাস রাস্তার ওপর পড়ে ছটফট করতে করতে মারা যায়! ধনা হালদারের দলের চেয়েও মেঘা দাসের দলে গুণ্ডা বেশী। তারা নাকি সবাই প্রতিজ্ঞা করেছে মেঘা দাসের খুনের বদলা তারা নেবেই। যতদিন না ধনা হালদারের গলার নলি ঠিক ঐ ভাবে তারা কেটে ফেলতে পারে, ততদিন তারা ভাতের সঙ্গে নুন খাবে না! ডাকাতরা কোথায় লুকোয় সে খবর পুলিশে না জানতে পারলেও অন্য ডাকাতরা ঠিক জেনে যায়। সেই জন্যই ধনা হালদারের আর বাঁচবার আশা ছিল না বলেই ভয় পেয়ে সে পুলিশের হাতে ধরা দিয়েছিল। ফাঁসী হয়নি অবশ্য। ধনা হালদার এখন যাবজ্জীবন জেল খাটছে।

সে যাই হোক, ধনা হালদার ধরা দেবার পর থেকেই বেলঘোরিয়ায় ডাকাতদের উৎপাত আস্তে আস্তে কমতে থাকে। অনেকে ধরা পড়ে যায়, অনেকে পালিয়ে যায়। যারা ধরা পড়েছিল, তাদের সবারই কেমন যেন মন মরা ভাব। তারা সবাই বলেছিল, আমরা ডাকাতি করা ছেড়ে না দিলে গুরুদেব আমাদের মেরে ফেলতেন! গুরুদেবের জন্য ধরা পড়লাম।

বেলঘোরিয়ায় আর এখন সে রকম ডাকাতের ভয় নেই। দু' চারটি নতুন গুণ্ডা মাঝে মাঝে মাথা উঁচু করে কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে তারা ধরা পড়ে কিংবা নিরুদ্দেশে চলে যায়। বেলঘোরিয়াকে ডাকাত

মুক্ত করার সব কৃতিত্ব পুলিশরাই নিতে চায় বটে কিন্তু সাধারণ লোকের ধারণা, সেই অদেখা গুরুদেবের জন্যই এসব হয়েছে।

এর মধ্যে, মাত্র দু' বছর আগে আমার বন্ধু কৌশিকের একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল বেলঘোরিয়ায়। সেটা ঠিক একটা গল্পের মতন। কৌশিককে আমি খুব ছেলেবেলা থেকে চিনি, খুব ভালো ছেলে, অকারণে মিথ্যে কথা বলা তার স্বভাব নয়। সেই জন্যই তার কথা অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই।

কৌশিক থাকে ব্যারাকপুরে, সেখানে একটি কলেজে পড়ায়। বেলঘোরিয়ায় কৌশিকের বড় মামার বাড়ি। যখন বেলঘোরিয়ায় খুব ডাকাতের উৎপাত বেড়েছিল, সেই সময় কৌশিকের বড় মামা ভয় পেয়ে বাড়ি ঘরে তালা দিয়ে চলে এসেছিলেন কলকাতায়। সব ঝঞ্ঝাট মিটে যাবার পর তিনি আবার সেখানে ফিরে গেছেন। তাঁর কোনোদিন কোনো বিপদ হয়নি।

দু' বছর আগে কৌশিকের বড় মামা খুব অসুখে পড়েছিলেন। তখন প্রত্যেকদিনই বিকেলবেলা কৌশিক ট্রেনে চেপে ব্যারাকপুর থেকে বেলঘোরিয়ায় এসে বড় মামাকে একবার করে দেখে যায়। সন্ধেবেলা সে ট্রেনে করে আবার ফেরে।

তখন শীতকাল। জানুয়ারি মাসের শেষদিকে পর পর দু'দিন বৃষ্টি হওয়ায় আরও দারুণ কনকনে ঠাণ্ডা পড়েছে। রাত্তিরবেলা ট্রেনে ফেরার সময় ঠাণ্ডা হাওয়ায় যেন হাত পা জমে যায়।

পর পর আট ন'দিন আসার পর বড় মামার অসুখটা অনেক কম মনে হলো। সেদিন বড় মামীমা বললেন, এই ঠাণ্ডার মধ্যে তুই আর রোজ রোজ আসিস না। এখন তো উনি অনেকটা ভালো হয়ে গেছেন। শুধু শুধু তুই শীতে কষ্ট পাচ্ছিস কেন?

বড় মামা সেরে উঠছেন বলে মামীমার মনটা ভালো ছিল, তিনি খিচুড়ি রান্না করে কৌশিককে খেয়ে যেতে বললেন। সেই জন্য সন্ধেবেলা কৌশিকের ফেরা হলো না। তাতে অবশ্য

কোনো অসুবিধে নেই, রাত্তিরবেলা ব্যারাকপুরে ফেরার অনেক ট্রেন আছে।

সেদিন যেন শীতটা সবচেয়ে বেশী। কট্‌সউলের শার্টের ওপর কৌশিক একটা মোটা ফুলহাতা, গলাবন্ধ সোয়েটার পরে এসেছে, তাও যেন ঠাণ্ডা লাগছে। বড় মামীমা বললেন, তুই তা হলে তোর বড় মামার শালটা গায়ে দিয়ে যা।

কৌশিক প্রথমে শালটা নিতে চায় নি। কিন্তু মামীমা বললেন, তুই তো আবার আসবি সামনের রবিবার, সেদিন শালটা ফেরৎ আনিস।

কৌশিকের বড় মামার বাড়ি স্টেশনের উল্টোদিকে, বেশ খানিকটা দূরে। সাইকেল রিক্সা করে এসে, ওভার ব্রীজ পেরিয়ে এদিকে এসে ট্রেন ধরতে হয়।

কৌশিক সাইকেল রিক্সা করে এসে যখন স্টেশনের ওপারে নামলো, তখন রাত সাড়ে ন'টা বাজে। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে প্লাটফর্মে এসে ওভারব্রীজে উঠতে যাবে, এমন সময় পাশের দিকে তাকিয়ে সে চমকে উঠলো। ওভারব্রীজের ডান পাশে দুটি আট দশ বছরের বাচ্চা ছেলে, হাতে একটা টিনের থালা। ওরা ভিক্ষে চায়। রেল স্টেশনে এমন বাচ্চা ভিখারী তো কতই থাকে। কিন্তু ছেলে দুটির সম্পূর্ণ খালি গা, এই নিদারুণ শীতের মধ্যে ঐ অবস্থায় দুটি বাচ্চা ছেলেকে দেখলে চমকে উঠতেই হয়!

কৌশিক গেঞ্জির ওপর শার্ট, তার ওপর সোয়েটার, তার ওপর আবার শাল জড়িয়েছে, আর এই দুটি বাচ্চা খালি গায়ে বসে আছে! ওরা এই অবস্থায় বাঁচবে?

কৌশিক ভাবলো, তার উচিত তার গায়ের শালটা খুলে ওদের দিয়ে দেওয়া। তাতে তার ত এমন কিছু অসুবিধে হবে না। কিন্তু শালটা তার নিজের নয়, বড়মামার। সে কি এটা কারুকে দান করে দিতে পারে। বড়মামার নিশ্চয়ই আরও শাল আছে, একটা দিলে

কী আর হবে ! তবে বড় মামা-বড় মামীমা হয়তো বিশ্বাস করবেন না যে কৌশিক শালটা কারুকে দান করেছে। ওঁরা ভাববেন, সে ওটা হারিয়ে ফেলেছে।

শালটা আর দিল না কৌশিক, ওদের থালায় একটা আধুলি ফেলে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো। কয়েক পা উঠে সে থমকে দাঁড়ালো আবার। তার খুব খারাপ লাগছে। সে ফিরে এসে পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে ওদের দিয়ে বললো, এই, তোদের আর বসে থাকতে হবে না। এবার বাড়ি যা ?

ছেলে দুটি দশ টাকার নোটটা নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখতে লাগলো। কৌশিক আর দাঁড়ালো না, ওভারব্রীজ পেরিয়ে এলো স্টেশনের দিকে।

এদিকটা একেবারে নিঝুম, একটাও মানুষ নেই। অথচ এই সময় তো প্লাটফর্ম লোকের ভিড়ে গম গম করে।

কাউন্টারে টিকিট কিনতে গিয়ে কৌশিক কারণটা বুঝতে পারলো। শিয়ালদায় কিসের যেন গোলমাল হয়েছে খুব, সন্ধে থেকে আর ট্রেন চলছে না। কখন যে ট্রেন চলবে তার ঠিক নেই, আজ রাতে নাও চলতে পারে।

কৌশিক দ্রুত চিন্তা করে নিল। ট্রেন না চললেও এমন কিছু বিপদ নেই ! এখান থেকে বাসেও ব্যারাকপুর যাওয়া যায়। এখনো গেলে বাস পাওয়া যেতে পারে। কৌশিক প্রায় দৌড়ে চলে গেল বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে।

কিন্তু সেখানেও তাকে হতাশ হতে হলো। ব্যারাকপুরের শেষ বাস এই একটু আগে চলে গেছে। আজ রাতে আর যাওয়ার উপায় নেই !

কৌশিক ঠিক করলো, তা হলে বড় মামার বাড়িতেই ফিরে যেতে হবে। রাতটা সেখানে কাটিয়ে সকালে যাবে ব্যারাকপুরে।

বিরক্ত ভাবে সে ফেরার পথে হাঁটতে লাগলো। এবারে আর

ওভারব্রীজে না উঠে সে রেললাইনের ওপর দিয়েই হেঁটে চলে এলো উল্টোদিকে।

এপাশে এখন সাইকেল রিক্সাও নেই একটাও। ট্রেন চলছে না, যাত্রী নেই, তাই রিক্সাওয়ালারাও চলে গেছে। অন্ধকারের মধ্যে বেশ খানিকটা রাস্তা কৌশিককে হেঁটে যেতে হবে।

কৌশিক খানিকটা পথ গেছে মাত্র, এমন সময় দু'তিনজন লোক হুড়মুড় করে এসে পড়লো তার গায়ের ওপর। তারপর সে কিছু বোঝাবার আগেই তারা তাকে ঠেলে ফেলে দিল মাটিতে, দু'হাত ধরে হেঁচড়িয়ে টেনে নিয়ে যেতে লাগলো মাটির ওপর দিয়ে। কৌশিক চিৎকার করে উঠলো, কিন্তু কেউ তার সাহায্যের জন্য এলো না। একজন লোক তাকে একটা লাথি মেরে বললো, একদম চুপ! জানে মেরে দেবো একেবারে!

ডাকাত-গুণ্ডার কথাটা কৌশিকের মনেই ছিল না একেবারে। পরপর ক'দিন ধরেই সে বেলঘোরিয়ায় আসছে, কোনোদিন কিছু হয়নি! ভয়ের চোটে কৌশিক কিছু চিন্তা করতেও পারলো না!

ওরা কৌশিককে একটা ঝোপের মধ্যে টেনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললো, কী আছে, শিগগির দে!

বড় মামার অসুখের জন্য যদি হঠাৎ কোনো দরকার লাগে, এই জন্য কৌশিক রোজ দেড় শো দুশো টাকা সঙ্গে নিয়ে আসে। ট্রেনে পকেটমারের ভয়ে টাকাটা সে রাখে গেঞ্জির মধ্যে, প্যান্টের পকেটে এমনি দশ পনেরো টাকা থাকে।

সে বললো, আমার কাছে তো বিশেষ কিছু নেই!

একজন ডাকাত ঠাস করে তার গালে একটা চড় কষিয়ে দিয়ে বললো, ঘড়ি খোল্! কী আছে শিগগির বার কর!

অন্য একজনের হাতের লম্বা একটা ছুরি সামান্য চাঁদের আলোয় চকচক করে উঠলো। আর একজন বললো, গায়ের শালটা দামী, খুলে নে!

আবছা অন্ধকারের মধ্যে কৌশিক ডাকাতদের কারুর মুখ দেখতে পায়নি ; কিন্তু একজনের গলার আওয়াজ তার খুব চেনা মনে হলো। সে অমনি বলে উঠলো, তুমি বিশ্বেশ্বর না ? আমি কৌশিক বোস ! চিনতে পারছো না ? আমায় বাঁচাও !

এই কথাটা বলেই কৌশিক সবচেয়ে বড় ভুল করলো। কৌশিকদের কলেজের লেবরেটরির একজন বেয়ারা ছিল বিশ্বেশ্বর। সে লেবরেটরির জিনিসপত্র ভীষণ চুরি করতো। দু' তিনবার ধরা পড়েও তার স্বভাব বদলায় নি। তাই তার চাকরি যায়। সেই এখন গুণ্ডা হয়েছে।

কৌশিকের কথা শুনেই একজন ডাকাত বললো, এই তোকে চিনে ফেলেছে। এই বিশে, ওকে খতম করে দে।

আর একজন বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, খতম করে দে। নইলে পুলিশের কাছে নাম বলে দেবে।

সবকটা ডাকাত মিলে কৌশিকের ওপর পড়ে তাকে ফেলে দিল মাটিতে। কৌশিক লড়াই করার চেষ্টা করেই বুঝলো সে একলা কিছুতেই পারবে না ওদের সঙ্গে। সে প্রায় কেঁদে ফেলে বললো, আমায় বাঁচাও, আমায় প্রাণে মেরো না, আমি কারুকে বলবো না, আমি সব টাকা বার করে দিচ্ছি, মেরো না।

একজন ডাকাত ছুরি তুলে বললো, চোপ।

ঠিক তক্ষুণি যেন বজ্রপাতের মতন আর কেউ যেন বিকট গলায় বলে উঠলো, এই।

যে ডাকাতটার হাতে ছুরি ধরা ছিল, সে হঠাৎ শূন্যে উঠে গেল !

কৌশিক তাকিয়ে দেখলো, অন্ধকারের মধ্যে প্রকাণ্ড চেহারার একজন মানুষ সেখানে দাঁড়িয়ে। বেড়াল যেমন ইঁদুরকে ধরে সেই রকম ভাবে সেই লম্বা মানুষটি এক হাতে সেই ছুরিওয়ালা ডাকাতটাকে ঝুলিয়ে রেখেছে। তারপর কমলালেবুর খোসা ছোঁড়ার মতন সেই মানুষটি ডাকাতটিকে অনেক দূরে ছুঁড়ে দিল।

অন্য ডাকাত দুটো চেঁচিয়ে উঠলো, বাপরে! গুরুদেব!

তারা পালানোর চেষ্টা করছিল, কিন্তু তার আগেই সেই দৈত্যের মতন লম্বা লোকটি দু'হাতে তুলে নিল ডাকাত দুটোকে, ঠকাশ করে ঠুঁকে দিল তাদের দু'জনের মাথা। তারপর তাদের দু'জনকেও ছুঁড়ে ফেলে দিল অনেক দূরে।

কৌশিক এমনই অবাক হয়ে গেছে যে কথা বলতে পারছে না। সে আস্তে আস্তে উঠে বসে হাঁ করে চেয়ে রইলো! গুরুদেবের কথা কৌশিকও শুনেছে আগে। ইনিই সেই গুরুদেব?

লোকটি অন্তত সাত ফুট লম্বা, তেমনি চওড়া, মাথার চুল জট পাকানো, খালি গা। শুধু একটা গেরুয়া রঙের লুঙ্গি পরে আছেন।

কৌশিককে চুপ করে বসে থাকতে দেখে সেই গুরুদেব বাজখাঁই গলায় বললেন, যা বাড়ি যা! আর ভয় নেই।

একটু আগেই কৌশিক ভেবেছিল, সে বুঝি মরেই যাবে। হঠাৎ বেঁচে গেল এই গুরুদেবের জন্য। দারুণ কৃতজ্ঞতায় সে গুরুদেবের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেল।

গুরুদেব সঙ্গে সঙ্গে পা সরিয়ে নিয়ে ধমক দিয়ে বললেন, ছুঁবি না। আমায় ছুঁবি না।

কৌশিক থতমতো খেয়ে গেল। গুরুদেব আবার বললেন, ভিখিরি ছেলে দুটোকে তোর শালটা দিতে পারলি না? তোরা চোর ডাকাতের হাতে জিনিস খোয়াবি, তবু প্রাণে ধরে কারুকে কিছু দান করতে পারিস না।

আর কিছু না বলে গুরুদেব পেছন ফিরে হাঁটতে লাগলেন।

কৌশিক, উঠে দাঁড়িয়ে যেতে লাগলো তাঁর পিছু পিছু। সে ভাবলো, গুরুদেব বুঝি তাকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। সে এতই অভিভূত হয়ে গেছে যে আর কোনো কথাও বলতে পারছে না।

গুরুদেব আবার মুখ ফিরিয়ে বললেন, আমার পিছু পিছু আসছিস কেন, যা, বাড়ি যা।

কৌশিক থমকে দাঁড়িয়ে গেল। কাছেই একটা পুকুর, গুরুদেব সেই পুকুরের জলে নেমে পড়লেন। তারপর বুক জলে গিয়ে গুরুদেব ডুব দিলেন, আর উঠলেন না।

কৌশিক আমাকে ঘটনা বলবার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, আর উঠলেন না ? তুই নিশ্চয়ই চোখের ভুল দেখেছিস ?

কৌশিক উত্তেজিত ভাবে আমার হাত চেপে ধরে বললো, না, আমি ভুল দেখিনি। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, তিনি আর উঠলেন না। সত্যি বলছি। বিশ্বাস কর।

বিশুর কাণ্ড

খুব ছেলেবেলায় আমরা একবার নরসিংহপুর বলে একটা জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। জায়গাটা খুব দূরে নয়, কলকাতা থেকে গাড়ি করেই যাওয়া যায়, কিন্তু ভীষণ গ্রাম গ্রাম মতন। গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে যেতে হয় দু' মাইল, সেই রাস্তাটা এত সরু যে সেখান দিয়ে গোরুর গাড়িও চলে না। রাস্তার দু' পাশে কত রকম গাছপালা, খুব সবুজ, আর সেখানে কী সুন্দর গন্ধ পাওয়া যায়। এরকম গন্ধ আমরা কলকাতায় পাই না। মাঝে মাঝে বাঁশ ঝোপ আর তাতে কঁ-ড়-ড়-ড় কঁ-ড়-ড়-ড় শব্দ।

সেই জঙ্গল পেরিয়ে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, সেখানে আমাদের বড় মামার বাড়ি। বড় মামা আমাদের নেমন্তন্ন করেছিলেন। বড় মামার দোতালা বাড়ির পাশেই তিনটে বড় বড় ধানের গোলা, আর একটু দূরেই মস্ত বড় একটা পুকুর। সেই পুকুরের ওপাশে জঙ্গল। সন্ধেবেলা সেখানে শেয়াল ডাকে।

দু' দিন পরেই রাত্তিরবেলা সেই জঙ্গলের মধ্যে একটা বিকট শব্দ শোনা গেল। তখন আমরা খেতে বসেছি। ওখানে তো ইলেকট্রিকের আলো নেই, হারিকেন—তাতে একটুখানি জায়গা মোটে আলো হয়, দরজার বাইরেই ঘুটঘুটে অন্ধকার। খেতে বসে আমরা সবাই গল্প করছি, এমন সময় সেই বিকট শব্দটা উঠলো। শব্দটা এমনই বিচ্ছিরি আর এত জোরে যে আমরা সবাই চমকে উঠলাম। বাবা ঠিক সেই সময় মাছের মুড়ো চিবুচ্ছিলেন। চমকে ওঠার জন্য তাঁর গলায় কাঁটা ফুটে গেল।

মা বললো, ওমা, ওটা কী ডেকে উঠলো ?

বড় মামা ভুরু কুঁচকে বসে আছেন। বাবা কথা বলতে পারছেন না, শুধু মুখ দিয়ে আঁ আঁ করে শব্দ করলেন। বাবার গলায় যে কাঁটা ফুটে গেছে, সেটা অন্য কেউ লক্ষ্যই করলো না, কেন না পুকুরের ধার থেকে আবার সেই রকম শব্দ উঠলো।

মা ভয়ে চোখ বড় বড় করে বললো, ওমা, বাঘ ডাকছে নাকি?

বড় মামা বললেন, বাঘ? বাঘ আবার এখানে কোথা থেকে আসবে! নিশ্চয় বিশুর কাণ্ড। বিশু! এই বিশু!

বিশু বড় মামার বড় ছেলে। আমার চেয়ে তিন চার বছরের বড়। তখন ক্লাস সেভেনে পড়ে। ভীষণ দুরন্ত। সন্ধেবেলা পুকুরে সাঁতার কেটে তার একটু জ্বর মতন হয়েছে বলে সে দুধ-মুড়ি খেয়ে শুয়ে পড়েছে।

বড় মামীমা বললেন, দেখেছো, এই জ্বর গা নিয়ে ছেলেটা আবার রাত্তিরবেলা বেরিয়েছে! নিশ্চয়ই কোনো হাঁড়ির মধ্যে মুখ দিয়ে ওরকম শব্দ বার করে আমাদের ভয় দেখাচ্ছে।

বাবা আবার বললেন, আঁ আঁ!

কিন্তু আমরা বাবার কথার মানে কিছুই বুঝতে পারলাম না।

বড় মামা বিশুকে ডাকতে ডাকতে ঘরের বাইরে গেলেন, অমনি বারান্দা থেকে বিশু সাড়া দিল। পুকুর ধার থেকে এত তাড়াতাড়ি তো সে চলে আসতে পারবে না!

ততক্ষণে বাবার গলা থেকে কাঁটা বেরিয়ে গেছে। বাবা বললেন, আমি তখন থেকে বলছি, ওটা বাঘ।

মা বললো, কই, তুমি আগে কিছু বলো নি তো!

অমনি আবার সেই শব্দটা শোনা গেল।

মা আর বড় মামীমা ভয়ে মাটিতে শুয়ে পড়লেন, আমার বুক একেবারে কেঁপে উঠলো। কার যেন পায়ের ধাক্কা লেগে উল্টে গেল হারিকেনটা। সবাই এক সঙ্গে চিৎকার করে উঠল, দরজা বন্ধ করে দাও, দরজা বন্ধ করে দাও!

বড় মামা খুব সাহসী। তিনি দাঁড়িয়েই রইলেন বারান্দায়। গম্ভীর ভাবে বললেন, বিশু, আমার টর্চটা নিয়ে আয় তো!

বড় মামা টর্চ নিয়ে পুকুর ধারে দেখতে যাচ্ছিলেন, সবাই মিলে জোর করে তাঁকে ধরে রাখা হলো। চিড়িয়াখানায় যেমন বাঘের ডাক শুনেছি, ঠিক সেইরকম হুম-আঁ- হুম-আঁ আওয়াজ হলো আরও কয়েকবার, তারপর সেটা মিলিয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

পরদিন সকালে নরসিংহপুর গ্রামে দারুণ হৈ চৈ। অনেকেই সেই বাঘের ডাক শুনেছে। কিন্তু কেউ ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। এদিকে তো কোন দিন বাঘ আসে নি। এখান থেকে সুন্দরবন অনেক দূরে। মাঝখানে একটা বড় নদী আছে। সেই নদী পেরিয়ে বাঘ আসবে কি করে? কেউ কেউ বললেন, হয়তো কোন সার্কাস পার্টির বাঘ পালিয়ে এসেছে।

মা ভয় পেয়ে সেই দিনই নরসিংহপুর থেকে চলে আসতে চাইছিলেন। বাবা ধমক দিয়ে বললেন, ছিঃ, তোমার এত ভয়? তোমার ভাই থাকেন এখানে, আর তুমি পালিয়ে যেতে চাইছো?

আমি রাত্তিরবেলা বাঘের ডাক শুনে ভয় পেয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু দিনের বেলা বেশ মজা লাগছিল। সত্যিকারের একটা বনের বাঘ আমাদের মামার বাড়ির এত কাছে এসেছিল, এটা একটা দারুণ ব্যাপার না?

সেদিন রাতে আর বাঘটার ডাক শোনা গেল না। সবাই ভাবলো বাঘটা চলে গেছে। কেউ কেউ বললো, বাঘ মোটেই আসেনি, ওটা অন্য কিছুর ডাক। হয়তো হুতুম প্যাঁচার। কিন্তু কেউ যে জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে দেখবে, সে সাহস নেই। সে গ্রামের কারুর বন্দুকই নেই যে! পাশের গ্রামে এক শিকারী থাকেন, তাঁকে খবর দেওয়ার কথা বলেছিল দু' একজন।

তার পরদিন খাল ধারে সাঁকোর কাছে একটা মরা মোষ পাওয়া

গেল। তলপেটের কাছে মাংস খুবলে কে যেন খেয়ে নিয়েছে। নিশ্চয়ই বাঘের কাণ্ড। তাহলে বাঘটা যায়নি।

সন্ধের পর কেউ আর ভয়ে ঘর থেকে বেরোয় না। বিকেলবেলা বড় মামা পাশের গ্রামে চলে গেলেন, সেই শিকারীকে ডেকে আনতে।

কিন্তু তার আগেই বিশু একটা কাণ্ড করে বসলো। সন্ধেবেলা আমরা ঘরের মধ্যে গুটিসুটি মেরে বসে আছি। অপেক্ষা করছি, কখন বাঘের ডাক শুনতে পাবো। হঠাৎ এক সময় দেখা গেল, আমাদের মধ্যে বিশু নেই। বিশু কোথায় গেল? খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ! কিন্তু সারা বাড়ি খুঁজেও বিশুকে পাওয়া গেল না।

বড় মামীমা ভয় পেয়ে বললেন, এই রে, বিশুটা, একলা একলা জঙ্গলে বাঘ দেখতে যায় নি?

বাড়িতে তিনজন লোক কাজ করে, তারা এই বাড়িতেই ঘুমোয়। বড় মামীমা বললেন, তোরা একটু খুঁজে দেখ না বিশু পুকুর ধারে গেছে কি না!

ওরা ভয়ে যেতে চায় না। বললো, খালি হাতে কি কেউ বাঘের কাছে যায়, মা ঠাকুরণ?

বড় মামীমা কাঁদতে লাগলেন। তখন সেই তিনজন লোক আর আমার বাবা একটা মশাল জ্বেলে আস্তে আস্তে এগোলেন পুকুরের দিকে আর চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন, বিশু, বিশু!

একটু বাদে সেই ডাকের উত্তর এলো ভয়ংকর গলায় হুম-অঁ, হুম-অঁ! অমনি সবাই দৌড়ে বাড়ির মধ্যে ফিরে এসে দরজার খিল দিল। বড় মামীমা ভাবলেন বিশুকে বুঝি বাঘে খেয়েই ফেলেছে। তিনি কাঁদতে লাগলেন খুব জোরে জোরে। বাঘের ডাকটা ক্রমশ এদিকেই এগিয়ে আসতে লাগলো। আমরা ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলাম।

এর পর যা হোল, তার খানিকটা আমি নিজের চোখে দেখেছি, খানিকটা কানে শোনা।

বিশুর তো দারুণ সাহস ! সে সত্যিই একলা একলা বনের মধ্যে ঢুকেছিল বাঘ দেখবার জন্য। ওর বুদ্ধি আছে, পাছে ও বাঘটার মুখোমুখি পড়ে যায়, তাই একটা মস্তবড়ো জারুল গাছে উঠে বসেছিল। বাঘটা সেদিন সন্ধের পরই এসে বসে আছে পুকুর ধারের জঙ্গলে। আর এমনিই কাণ্ড, এক সময় বাঘটা এসে সেই জারুল গাছটাতেই গা ঘষতে লাগলো। অত বড় বাঘের গা ঘষায় কাঁপতে লাগলো গাছটা। আর নীচে সত্যিকারের বাঘ দেখে বিশুরও গা হাত পা কাঁপছিল। এক সময় সে হাত পা ছেড়ে ধপাস করে পড়ে গেল নীচে, একেবারে বাঘের পিঠের ওপরে। বাঘ হুম-আঁ করে ডেকে উঠলো। এর আগে কেউ তো বাঘের পিঠে চাপেনি, তাই বাঘ প্রথমটায় বুঝতে পারলো না ব্যাপারটা। টেনে ছুট দিল। আর বিশুও ভয় পেয়ে জড়িয়ে ধরলো বাঘের গলা। বাঘ বিরক্ত হয়ে জোরে জোরে ডাকতে ডাকতে ছুটলো।

ক্রমশ বাঘ চলে এলো পুকুরের এ পাড়ে। আমরা তখন ভাবছি, বাঘ বুঝি আমাদের বাড়ি আক্রমণ করতে আসছে। হুড়মুড় করে আমরা উঠে গেলাম দোতলায়। সিঁড়িতে লোহার গেট। বাবা বললেন, বাঘ কিছুতেই সে গেট ভেঙে ওপরে উঠতে পারবে না।

দোতলা থেকে আমরা দেখলাম এক অদ্ভুত দৃশ্য। আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে ছুটে গেল বাঘ, আর তার পিঠের ওপর গলা জড়িয়ে শুয়ে আছে বিশু। আমরা প্রথমে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু সত্যিই আমাদের চোখের সামনে দিয়ে বাঘের পিঠে চেপে চলে গেল বিশু। বড় মামা দেয়ালে কপাল ঠুকতে লাগলেন, আমার মাও কাঁদতে লাগলেন।

বিশু কিন্তু বাঘের পেটে যায় নি। ফিরে এসেছিল সম্পূর্ণ সুস্থ ভাবে। সে এক মজার ব্যাপার। বিশু বাঘের পিঠে চেপেই বুঝতে পেরেছিল, একবার সে মাটিতে পড়ে গেলেই বাঘ তাকে খেয়ে ফেলবে।

পিঠের ওপর থেকে তো বাঘ তাকে খেতে পারবে না ! তাই সে খুব জোরে ধরে ছিল বাঘের গলা ।

এদিকে ঐ বাঘটা সত্যি একটা সার্কাস থেকে পালিয়েছিল। ছুষ্টুমী করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ক'দিন। পিঠের ওপর একটা মানুষ বসে পড়ায় সেও ভয় পেয়ে গেছে। ছুটতে ছুটতে সোজা হাজির হলো কুড়ি মাইল দূরে সেই সার্কাসের তাঁবুতে। সেখানকার লোকজন ওদের দেখতে পেয়ে বিশুকে নামিয়ে নেয়। বাঘটা তখন পোষা বিড়ালের মতন লেজ নাড়তে থাকে।

বিশু অবশ্য বলে, ওটা মোটেই সার্কাসের বাঘ ছিল না। ওটা ছিল খাঁটি সুন্দরবনের বাঘ। এক সময় বিশুকে নিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

অন্ধকারে গোলাপ বাগানে

সাড়ে সাতটার সময় মাস্টারমশাই আসবেন, ঠিক সাতটা বেজে কুড়ি মিনিটে আলো নিভে গেল। এখন লণ্ঠন জ্বালতে হবে। তিনতলার ঘরে ঠিক জানালার ধারেই সুজয়ের পড়ার টেবিল। সে সেখানেই বসে রইলো চুপ করে। জানালার বাইরে গোটা কলকাতাটাই অন্ধকার।

দোতলায় মায়ের গলা শোনা যাচ্ছে। মা শিবুকে বললো হারিকেন জ্বালতে। শিবু বললে, দেশলাই খুঁজে পাচ্ছি না। রোজই এই রকম হয়। আলো নিভে গেলে তখন আর দেশলাই কিংবা টর্চ খুঁজে পাওয়া যায় না।

সুজয়দের বাড়িতে একটা চার ব্যাটারির বড় টর্চ আছে। খুব জোর আলো হয়। সেই টর্চটা কোথায়?

সুজয় চোখ বুজে ভাববার চেষ্টা করলেন। চোখ বুজলে সে অনেক কিছু দেখতে পায়।

কিন্তু চোখ বুজে সুজয় একটা অন্য দৃশ্য দেখলো। ঠিক যেন সিনেমার ছবির মতন···

···অন্ধকার মাঠের মধ্যে দিয়ে টর্চ হাতে হেঁটে আসছে একজন লোক···লোকটির মুখ দেখা যাচ্ছে না, টর্চের আলোয় মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে শুধু লোকটির পায়ে সাদা কেড্‌স্ জুতো, তার প্যান্টের রং হল্‌দে···লোকটি হাঁটছে খুব তাড়াতাড়ি, টর্চের আলো পড়ছে এদিক ওদিক···

···মাঠতো নয়, ওটা একটা বাগান। টর্চের আলোয় দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো নানারকম ফুল গাছ, লোকটি এক একটি গাছের

ওপরে আলো ফেলে দেখছে, তারপর আলোটা একটি গোলাপ গাছের ওপরে থেমে গেল। তিনটে বেশ বড় গোলাপ ফুল ফুটে আছে সেই গাছে···

এবার লোকটি হাঁটু গেড়ে বসলো সেই গাছটির কাছে। এখনো লোকটির মুখ দেখা যাচ্ছে না, গায়ে একটা ডোরাকাটা হাওয়াই শার্ট ···হাঁটু গেড়ে বসে লোকটির প্যাণ্টের পকেটে ডান হাতটা ঢোকানো, তারপর কী যেন একটা জিনিস বার করে আনলো···

সুজয়ের বুকটা ধক্ করে উঠলো···লোকটার হাতে ওটা কী? টর্চটা মাটিতে রাখলো, তারপর দু'হাত দিয়ে সেই জিনিসটা আলোর সামনে আসতেই দেখা গেল সেটা একটা গোটানো ছুরি, সেটার ফলাটা টেনে খুলে ফেলতেই ঝক্ঝক করে উঠলো আলোয়···দূরে একটা কুকুর ডাকছে···ডাকতে ডাকতে কুকুরটা যেন এগিয়ে আসছে কাছে···

—এই যে হারিকেন এনেছি।

সুজয় চমকে উঠতেই ঘোর কেটে গেল তার। শিবু হারিকেন নিয়ে এসেছে। সুজয়ের একটু রাগ হলো। ঈস্ নষ্ট হয়ে গেল ছবিটা।

একতলায় একটা কুকুর ডাকছে। এতো চেনা ডাক। সুজয়ের নিজের কুকুর ডুংগা হঠাৎ ডেকে উঠছে। ডুংগা জাতে অ্যালসেসিয়ান, খুব শান্ত কুকুর, তবু লোকে দেখলে ভয় পায়। ডুংগা সহজে ডাকে না। এখন হঠাৎ ডাকছে কেন?

—আর একটু পরে আলোটা আনতে পারলে না?

শিবু বললো, ওমা, তুমি অন্ধকারে বসে থাকবে, মা বললেন, শিগ্‌গির হারিকেনটা দিয়ে আয়। খোকাবাবু অন্ধকারে ভয় পাবে।

সুজয় বললো. হুঁ, আমি অন্ধকারে ভয় পাবো, এই, ডুংগা ডাকছে কেন রে?

—নিশ্চয়ই কোনো ছাতাওয়ালা বাবু এসেছে।

তা ঠিক। ডুংগা একদম ছাতা পছন্দ করে না। কারুর হাতে ছাতা দেখলেই বিরক্তি প্রকাশ করে।

—যা তো নিচে গিয়ে দেখে আয় !

শিবু চলে যেতেই সুজয় ভুরু কুঁচকে বসে রইলো। হঠাৎ চোখ বুজে সে ঐ দৃশ্যটা দেখলো কেন ? কোনো সিনেমায় কি শিগ্‌গিরই এ রকম কোন দৃশ্য দেখেছে ? না তো ! কোনো গল্পের বইতে পড়েছে ? তাও না ! অন্ধকারের মধ্যে বাগানে একটা লোক, একটা গোলাপ গাছের সামনে ছুরি হাতে নিয়ে বসা—লোকটার মুখ দেখা যায় নি···লোকটা কি ছুরি দিয়ে গোলাপ গাছটা কেটে ফেলবে ? কেন ?

সুজয় আবার চোখ বুজলো। যদি বাকি অংশটা দেখা যায়। কিন্তু এবার কিছুই দেখা গেল না। এমনি চোখ বুজলে যে-রকম হয় সেই রকম।

হারিকেনের আলোটা খুব কমিয়ে টেবিলের তলায় নামিয়ে রেখে আবার চোখ বুজে দেখার চেষ্টা করলো সুজয়। এবারও দেখা গেল না কিছুই।

দরজার কাছে আওয়াজ হতেই সুজয় চোখ খুলে তাকালেন। মাস্টারমশাই এসেছেন। হাতে একটা ছাতা।

—কী সুজয়, হারিকেনটা নামিয়ে রেখেছো কেন ?

সুজয় উঠে দাঁড়িয়ে হারিকেনটা তুলে বললো, আসুন তপনদা, আপনি আজ আবার ছাতা নিয়ে এসেছেন ?

সুজয় পড়ে ক্লাস নাইনে। তার মাস্টারমশাই সবেমাত্র এম, এ, পাশ করেছেন। প্যাণ্ট-শার্ট পরেন আর খুব লবঙ্গ খেতে ভালোবাসেন। সব সময় মুখে লবঙ্গ।

মাস্টারমশাই বসলেন, বাঃ, বৃষ্টি হলেও ছাতা আনতে পারবো না ? তোমার কুকুর একেবারে ঘেউ ঘেউ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আমায় চেনে এতদিন ধরে দেখছে···

এই ডুংগা যে সুজয়ের কতবড় বন্ধু তা তো মাস্টারমশাই জানেন না। ডুংগার মনে কোনো কষ্ট হলে সুজয় সহ্য করতে পারে না।

—বৃষ্টি হচ্ছে বুঝি ?

—আমাদের পাড়ায় তো তুমুল বৃষ্টি। তোমাদের এখানেও টিপি টিপি করে শুরু হয়েছে।

সুজয় জানালা দিয়ে বাইরে হাত বাড়িয়ে দেখলেন, সত্যিই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে।

অমনি সুজয়ের মনে পড়লো, অন্ধকার বাগানে যে লোকটা সাদা কেড্‌স পরে হাঁটছিল, তার জুতোয় কোনো কাদা ছিল না।

চেয়ার টেনে বসে মাস্টারমশাই বললেন, যে অঙ্কগুলো দিয়েছিলাম, করেছো?

সুজয় খাতা বার করলো। কিন্তু পড়াশুনোয় আজ তার মন বসছে না। যদিও সামনেই পরীক্ষা।

এক সময় মাস্টারমশাই বললেন, এ কি, সুজয়, মন দিচ্ছো না কেন? কতবার বলছি লিখতে, তুমি পেন্সিল হাতে বসে আছো!

সুজয় লজ্জা পেয়ে বললে, ও! এই যে লিখছি! কী যেন বলছিলেন তপনদা?

মাস্টারমশাই বললেন, তোমার দোষ কী; এই হারিকেনের আলোতে কি পড়া যায়। পাখা বন্ধ, যা গরম, পর্শু তো রবিবার, সেদিন আমি দুপুরে আসবো……

এক ঘণ্টার মধ্যেই মাস্টারমশাই চলে গেলেন। ঠিক এর পরেই সুজয়ের খাবারের ডাক পড়ে।

খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে রোজ সুজয় খানিকক্ষণ ডুংগাকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

শহরের এ দিকটা এখনও অন্ধকার। বৃষ্টি এখনও টিপি টিপি পড়ছে। ডুংগা জলে ভিজতে চায় না। গায়ে একটু জল লাগলেই দু'কান লট্ পট্ করে গা ঝাড়া দেয় খুব জোরে। সুতরাং আজ আর ছাদে ঘোরা যাবে না।

সুতরাং ডুংগাকে নিয়ে সুজয় চিলে কোঠায় বসে রইলো। ডুংগা

একবার করে বাইরে মুখ বাড়ায়, আর নাকে বৃষ্টি লাগলেই ফিরে আসে।

সুজয়ের আবার মনে পড়লো সেই দৃশ্যটা।

সুজয় মাঝে মাঝেই চোখ বুজে এরকম সব জিনিস দেখতে পায়। কখন যে দেখবে তা ঠিক নেই। এক একদিন কিছুই দেখে না।

দৃশ্যগুলো নানা রকম হয়। পাহাড়ের পাশের সরু রাস্তা দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে তিনজন ছেলে···জঙ্গলের মধ্যে একটা গাছ ভেঙ্গে পড়লো মড় মড়িয়ে···। একটা ফুলের পাপড়ি দুলছে আস্তে আস্তে আর একটা মৌমাছি বোঁ বোঁ করে ঘুরছে তার পাশে···। সোনারপুরে ওর ছোটমামার বাড়ির গোয়ালঘরে একটা শেয়াল ঢুকে বসে আছে, দুটো গরু ডাকছে হাম্বা হাম্বা······।

চোখ বুজে সুজয় যে দৃশ্যগুলি দেখে, তা সে কিন্তু আগে সত্যি সত্যি দেখে নি কখনো। চোখ বুজলে দৃশ্যগুলি কোথা থেকে এসে যায় কে জানে। একবার সে দেখেছিল, সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের সভায় দাঁড়িয়ে কথা বললেন শিবাজী। একেবারে সিনেমার মতন স্পষ্ট।

এসব কথা অন্য কারুকে বললে তারা বিশ্বাস করে না। ইস্কুলের বন্ধুদের দু' একবার বলতে গেছে, তারা অমনি বলেছে, যা, যা, খুব গাঁজা দিচ্ছিস!

অনেকগুলো ঘটনা মিলেও যায়। সোনারপুর থেকে ছোটমামা এসে সুজয়ের মাকে বলেছিলেন। জানো, মেজদি, পর্শু দিন কী কাণ্ড। কোথা থেকে একটা শেয়াল এসে আমাদের গোয়াল ঘরটায় ঢুকে পড়ে···।

সুজয় উত্তেজিতভাবে বলেছিল, জানি, আমি জানি, দুটো গরু ভয় পেয়ে খুব ডাকছিল···।

ছোটমামা ভুরু কুঁচকে বলেছিলেন, তুই জানিস, মানে? পর্শু রাত্তিরের ব্যাপার, এর মধ্যে তো কেউ আসে নি সোনারপুর থেকে।

সুজয় তবু বলেছিল, হ্যাঁ, আমি জানি, তোমরা সবাই মিলে তাড়া

করলে···শেয়ালটা দৌড়ে পালাবার সময় একজন কে যেন লাঠি ছুড়ে মারলো, কিন্তু ওর গায়ে লাগে নি···।

ছোটমামা হাসতে হাসতে বলেছিলেন, মেজদি তোমার ছেলেটা কিন্তু খুব গল্প বলতে পারে। আমি যেই শেয়ালের কথা বলেছি···।

বিশ্বাস করে না, কেউ বিশ্বাস করে না। গল্প নয় সুজয় যে ঐ দৃশ্যটা সত্যিই দেখেছিল পর্শু দিন, তা কারুকে বিশ্বাস করানো যাবে না।

তা হলে, অন্ধকার বাগানে টর্চ হাতে লোকটি যে একটা গোলাপ ফুলের গাছের সামনে বসলো, সে দৃশ্যটাও সত্যি ?

ওরকম গোলাপ বাগান কোথায় আছে ? কলকাতায় কি থাকতে পারে ? তা পারে নিশ্চয়ই, কিন্তু আজ কলকাতায় বৃষ্টি পড়বে, ওখানে বৃষ্টি নেই···। তা হলে কি দূরে কোন জায়গায় ? সোনারপুরে ছোটমামার বাড়ীতে কি বাগান আছে ? দু'মাস আগে সুজয় যখন সেখানে বেড়াতে গিয়েছিল, তখন দেখেছিল, ছোটমামাদের বাড়ীর সামনে বেগুন গাছের ক্ষেত। এত তাড়াতাড়ি কি সেখানকার বেগুন গাছ তুলে গোলাপ ফুলের গাছ হতে পারে ? নাঃ !

নিচে নেমে এসে সুজয় মাকে জিজ্ঞেস করলো, মা, আমাদের চেনাশুনো কারুর বাড়িতে ফুল বাগান আছে ? এত বড় বড় গোলাপ ফুল ফোটে ?

মা অবাক হয়ে বললেন, ফুল বাগান ? কাদের ফুল বাগান আছে ? হঠাৎ এই কথা জিজ্ঞেস করছিস কেন ?

সুজয় বললে, না, এমনি···।

তিনতলার ঘরে সুজয় একলা শোয়। ঘুমোবার আগে সুজয় চোখ বুজে অনেক চেষ্টা করলো সেই দৃশ্যটা আর একবার দেখবার। কিন্তু একবার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে আর যেমন জোড়া লাগে না, সেইরকম সেই দৃশ্যটাও আর ফিরে এলো না।

সকালবেলা মা সুজয়কে ডাকতে এসে দেখলেন, সুজয়ের ঘুমন্ত

মুখে কী রকম যেন একটা অস্বস্তির ভাব নেমে আসে। ভুরু দুটো কোঁকড়ানো যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে কিছু চিন্তা করছে।

একটু কিছু অন্য রকম দেখলেই মায়েরা প্রথমেই ভাবেন, ছেলের জ্বর হয়েছে কি না।

মা সুজয়ের কপালে হাত রাখলেন। না, জ্বর নেই তো।

—এই সুজয়, ওঠ্।

দু'বার ডাকতেই সুজয় চোখ মেললো।

—হ্যাঁ রে, তুই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কী ভাবছিলি?

—কই, কিছু না তো?

ঘুমের মধ্যে ভুরু কুঁচকেছিলি কেন? কোনো বাজে স্বপ্ন দেখেছিস বুঝি?

সুজয়ের কিছু মনে নেই। অনেক স্বপ্ন পরদিন সকালে উঠে আর মনে পড়ে না। কিন্তু সুজয় জেগে জেগে চোখ বুজে যে দৃশ্যগুলো দেখে, সেগুলো তার ঠিক মনে থাকে।

সুজয়ের স্কুল সাড়ে দশটায়। বাবা অফিস যাবার সময় সুজয়কে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে যান বলে সুজয়কে বাবার সঙ্গে সঙ্গে সাড়ে ন'টার মধ্যেই বেড়িয়ে পড়তে হয়। সেইজন্য সকালের জলখাবার খেয়ে নেওয়ার পর একঘণ্টা পড়তে না পড়তেই তাকে যেতে হয় স্নান করতে।

পুরোনো আমলের বাড়ি তো, তাই সুজয়ের ঘরটা বিরাট। এই স্নানের ঘরটা সুজয়ের খুব ভালো লাগে। দরজাটা বন্ধ করলেন তখন একা একা, নিরিবিলি লাগে। এখানে অনেক কিছু চিন্তা করা যায়।

অবশ্য বাথরুমে বেশীক্ষণ কাটাবার উপায় নেই সকালে। বাবার অফিসের দেরি হয়ে যাবে। তিনি তাড়া দেবেন।

শাওয়ারটা খুলে দিয়ে সুজয় তার তলায় দাঁড়ালো। শাওয়ারের জল খুব তোড়ে পড়বার সময় আপনা থেকেই চোখ বুজে আসে। চোখ বুজতেই সুজয় আর একটা দৃশ্য দেখতে পেল।

···একটা খুব বড় বাড়ি, দোতালায় টানা বারান্দা। সেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে একজন বুড়ো মতন লোক খুব রাগারাগি করছেন। দূরে দু'তিনজন লোক কাঁচুমাচু ভাবে দাঁড়িয়ে···বুড়ো লোকটির বুকের লোম পাকা, শুধু একটা ধুতি পরা, বেশ বড় গোঁফ, হেঁড়ে গলায় তিনি চিৎকার করে বললেন, আমার চাবি কোথায়? আমার চাবির গোছা কোথায় গেল? মহা সর্বনাশ হয়ে গেছে···।

সুজয় চোখ খুলে ফেললো। আর কিছু দেখা গেল না। ঐ বুড়োলোকটি কে? ঐ বাড়িটা কোথায়? সে কিছুই জানে না। তবু সে কেন দেখলো ঐ দৃশ্যটা? কোথায় কার চাবির গোছা হারিয়ে গেছে, তা নিয়ে সুজয়ের মাথা ঘামাবার কি দরকার?

কিন্তু ভুলতে চাইলেও সুজয় ভুলতে পারে না। খেতে বসেও সুজয়ের কানে বাজে সেই বুড়ো লোকটির চিৎকার, আমার চাবির গোছা কোথায় গেল? আমার মহা সর্বনাশ হয়ে গেছে···।

স্কুল ছুটি হয়ে গেল এক পীরিয়ড পরেই। ডিবেট কমপিটিশানে ক্লাশ টেনের একটি ছেলে ফার্স্ট হয়েছে। বাড়ী চলে এসে সুজয় শুয়ে রইল নিজের ঘরে। এরকম দুপুর বেলা সুজয় কোন দিন শুয়ে থাকে না, বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে যায় কিংবা গল্প করে। বৃষ্টি বাদলা হলেও ঘরে বসে গল্পের বই পড়ে।

কিন্তু সুজয়ের শরীর ভালো লাগছে না। মনটা একটু যে ব্যথা ব্যথা করছে। সুজয় শুয়ে রইলো চোখ বুজে। এখন আর যে অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু আজ সকালে দেখা দৃশ্যটা মনে পড়ছে বারবার। কে ও বুড়ো লোকটা? সুজয় কোন দিন ঐ রকম লোককে দেখে নি, খুব জোর দিয়ে বলতে পারে।

একটু পরেই তার বন্ধু অভিজিৎ এসে হাজির। অভিজিৎ অবশ্য স্কুলে পড়ে, আশ্চর্য তাদের স্কুলও আজ ছুটি। ওদের স্কুলের একজন টিচার রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছেন।

অভিজিৎ উত্তেজিত ভাবে বললে এই, দমদম যাবি?

সুজয় বললো, দমদম হঠাৎ ? দমদম যাবো কেন ?

—দমদমে আমার মামার বাড়ী। বেশ আজ ওখানে থাকবো কাল চলে আসবো।

—কাল ইস্কুল যাবো না ?—ধুৎ কাল তো রবিবার।

—রবিবার দুপুরে আমার মাস্টার মশাই আসবেন বলেছেন যে।

—কাল সকাল দশটা এগারোটার মধ্যে ফিরে আসবো। বাবা অফিসের কাজে বহরমপুর যাচ্ছেন। আজ সন্ধ্যা বেলা অফিসের গাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন, আমাদের দমদমে নামিয়ে দিয়ে যাবেন। সকালে আমরা ফিরে আসবো বাসে করে। ঐ বাসে করে ফিরে আসার ব্যাপারটা শুনেই সুজয় বেশী উৎসাহ বোধ করছে। অনেকক্ষণ বাসে চাপতে সুজয়ের খুব ভালো লাগে। কত রকম মানুষ দেখা যায়।

মায়ের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে আগে।

অভিজিৎকে বসিয়ে রেখে সুজয় গেল মায়ের ঘরে। মা এই সময় উপন্যাস পড়েন। মায়ের পাশে বসে সুজয় খুব নরম ভাবে বললো, মা একটা কথা বলবো ?

মা বললেন, পয়সা চাই বুঝি ? পশুদিন তোকে একটা টাকা দিয়েছিলুম না ?

—না, মা, পয়সা না। অভিজিৎ এসেছে, ও বলছিল···।

একটু পরেই মা রাজি হয়ে গেলেন।

ওরা বেড়িয়ে পড়লো বিকেল পাঁচটার মধ্যে। অভিজিৎদের মামার বাড়ি নাগেরবাজার ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে। পৌঁছোতে বেজে গেল সাড়ে ছটা। তখন সন্ধে নেমেছে।

সুজয়ের বাবা গাড়ি থেকে নামলেন না, গেটের কাছে ওদের ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন গাড়ি ঘুরিয়ে।

মস্ত বড় লোহার গেট, সামনে খানিকটা লন, সামনের দিকে শুর্কি বেছানো রাস্তা। গেটটা খুলতেই ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হলো, অমনি দোতলা থেকে কে যেন গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলো, কে ?

অভিজিত বললো, আমি।—আমি কে ?

—আমি অভিজিৎ···খোকন। দাদু, আমি খোকন, বালিগঞ্জ থেকে এসেছি!

—ও খোকন ? আয়! কার সঙ্গে এলি ?

কারুকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না, শুধু কথা শোনা যাচ্ছে।

দুজনে চলে এলো বৈঠকখানায়। খুব বড় বাড়ি, কিন্তু কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা। একজন বয়স্কা মহিলা একতলায় একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, আরে, খোকাবাবু যে! এসো, এসো। সঙ্গে এটি কে ?

অভিজিৎ বললেন, আমার বন্ধু সুজয়। বড় মাসীমা, কেমন আছো তুমি ?

অভিজিৎ সেই মাসীমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই সুজয়ও প্রণাম করলো।

যদিও এটা অভিজিতের মামার বাড়ি, কিন্তু মামারা এখানে কেউ নেই। এক মামা বিলেতে, আর এক মামা দিল্লীতে। এখানে থাকেন সুজয়ের দাদু আর দিদিমা। আর এই মহিলাটি দূর সম্পর্কের মাসী।

অভিজিৎকে সেই মাসী তাঁর ঘরে নিয়ে বসাতে চাইছিলেন, অভিজিৎ বললো, দাঁড়াও বড় মাসী, আগে দাদুকে প্রণাম করে আসি। মাসীমা বললেন, দেখিস, সাবধান। কর্তার মেজাজ খুব খারাপ হয়ে আছে।

সুজয়কে নিয়ে অভিজিৎ সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলো ওপরে। লম্বা টানা বারান্দায় একটা টিমটিমে আলো জ্বলছে। সেই বারান্দার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একজন বুড়ো লোক। তাঁকে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল সুজয়। তার বুকের মধ্যে ছম্ ছম্ শব্দ হচ্ছে। জীবনে এমন অবাক সে কখনো হয় নি।

এই তো সেই লম্বা বড বারান্দা। আর এই বুড়ো লোকটিকেই তো সে কাল দেখতে পেয়েছিল বাথরুমে চোখ বুজে। ইনিই তো

চাবি হারিয়ে গেছে বলে চ্যাচাচ্ছিলেন। অভিজিৎ বললো, কী হলো দাঁড়ালি কেন? উনি আমার দাদু।

সুজয় আর অভিজিৎ গিয়ে প্রণাম করলো তাঁকে। অভিজিৎ বললো, দাদু, এ আমার বন্ধু সুজয়।

দাদু বললেন, তোর মা কেমন আছে? সে এলো না কেন? আজ আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে রে! আমার চাবির গোছা হারিয়ে গেছে, সিন্দুকের চাবি, ট্রাঙ্কের চাবি, ব্যাঙ্কের লকারের চাবি, সব এক সঙ্গে ছিল।

সুজয়ের বুকের মধ্যে টিপ টিপ করছে এখনো। সে জানতো, ঠিক মিলে যাবে, চাবির কথা মিলে যাবেই। অভিজিতের দাদুর বুকের সব চুল পাকা।

অভিজিৎ বললো, কখন হারালো দাদু?

এই তো, সকালবেলা। কী কাণ্ড ছাখ্ না। নিশ্চয়ই কেউ বদ মতলবে লুকিয়ে রেখেছে। আমি বাড়ি ছেড়ে দু'দিন কোথাও যাই নি, চাবি কি করে হারাবে?

পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন অভিজিতের দিদিমা। তিনি বললেন, খোকন এসেছিস! ছাথ না কী কাণ্ড! চাবি হারিয়ে ফেলে তোর দাদুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

দাদু বললো, হবে না? কেউ যদি ঐ চাবি নিয়ে সিন্দুক খোলে? সারাদিন ধরে আমি পাহারা দিচ্ছি, ঘর থেকে একেবারে বেরুই না। কিন্তু এরকম ভাবে ক'দিন যাবে?

অভিজিৎ জিজ্ঞেস করলো, নতুন চাবি করানো যায় না?

দাদু বললেন, কতকাল আগেকার চাবি, ও কি এখন পাওয়া যায়? ব্যাঙ্কে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি, কিন্তু সিন্দুকের মধ্যে অনেক দামী জিনিসপত্র রয়েছে···।

দিদিমা বললেন, ওরা ছেলেমানুষ, ওরা আর কী করবে তার। আয় তোরা ঘরে আয়। এই ছেলেটি কে? তোমার নাম কী?

সুজয় কথা বলতে গেল কিন্তু তার গলা দিয়ে যেন আওয়াজই বেরুচ্ছে না। অতিকষ্টে সে নিজের নামটা বলল।

দিদিমা ডাকলেন, রজত, রজত!

কুড়ি-বাইশ বছর বয়সের একটি ফিটফাট চেহারার ছেলে এলো সেই ডাক শুনে।

দিদিমা বললেন, রজত, এদের জন্য মিষ্টি এনে দাও। ঠাকুরকে বলো মাংস রাঁধতে। ওরা আজ রাত্রে এখানে খাবে।

ছেলেটি চলে গেলে অভিজিৎ জিজ্ঞেস করলো, দিদিমা, ও কে? ওকে তো আগে দেখি নি?

দিদিমা বললেন, সেই যে মুর্শিদাবাদ গিয়েছিলাম, সেখান থেকে ওকে এনেছি। ও সম্পর্কে আমার এক কাকার ছেলে। লেখাপড়া বেশী শেখেনি, ও সবে একটা হোটেলে কাজ করছিল। তাই ওকে নিয়ে এসেছি। আমাদের বাড়িতে থাকবে।

মিষ্টি আর জলটল খাবার পর সুজয়কে নিয়ে অভিজিৎ গেল ছাদে। মস্ত বড় ছাদ। বাড়ির চারপাশটা ফাঁকা। আকাশে একটু একটু জ্যোৎস্না। নারকোল গাছের পাতায় হাওয়ার সর সর শব্দ হচ্ছে।

—কী রে তুই কোনো কথা বলছিস না কেন? কী বলবো?

—একেবারে গুম মেরে আছিস যে? তোর ভালো লাগছে না?

—হ্যাঁ!

সুজয় তখনও ভাবছে, সে যে আজ এখানে আসবে, তার তো কোন ঠিক ছিল না আগে থেকে। তবু সে এই বাড়িতে তার বন্ধুর দাদুর চাবি হারানো দৃশ্যটা দেখলো কেন আগে থেকে! দেখেই বা কী লাভ হলো?

অভিজিৎ বললো, এই বাড়ির পেছন দিকটায় একটা বেশ বড় বাগান আছে। দেখতে যাবি?

সুজয় চমকে উঠে বললো, বাগান?

—হ্যাঁ। খুব চমৎকার বাগান। দাদুর খুব ফুল গাছের সখ। যাবি? —এক্ষুনি!

অভিজিৎ একটা টর্চ চেয়ে নিল দিদিমার কাছ থেকে। সুজয়ের আর ধৈর্য থাকছে না, সে এক্ষুনি ছুটে গিয়ে বাগানটা দেখতে চায়।

ঠিক সেই বাগানটাই কিনা তা বুঝতে পারলো না সুজয়। অন্ধকারের মধ্যে সুজয় শুধু টর্চের আলোয় কয়েকটা গাছ দেখেছিল। সেটা যে-কোন বাগান হতে পারে! তা ছাড়া, সেই বাগানে ছুরি হাতে একটা লোকের সঙ্গে অভিজিৎ-এর দাদুর সিন্দুকের চাবি হারাবার সম্পর্ক কি?

অভিজিৎ-এর হাত থেকে টর্চটা নিয়ে সুজয় প্রত্যেকটা ফুল গাছের ওপর আলো ফেলতে লাগলো। বেশীক্ষণ খুঁজতে হলো না। সুজয় দেখতে পেল, একটা গোলাপ গাছে ফুটে আছে তিনটে গোলাপ ফুল।

সাদা গোলাপ। কোন সন্দেহ নেই, কাল এই গোলাপ গাছটাকেই দেখেছিল সুজয়।

অভিজিৎ-এর হাতে টর্চটা দিয়ে সে বললো, তুই একটু এগো, আমি জুতোর ফিতেটা বেঁধে নিচ্ছি।

অভিজিৎ বললো, সামনেই একটা সুন্দর বেঞ্চ আছে, চল, ওখানে বসে বেঁধে নিবি।

—তুই বেঞ্চে গিয়ে বোস, আমি আসছি।

অভিজিৎ এক পা এগোতেই সুজয় বসে পড়লো গোলাপ গাছটার পাশে।

গোলাপ গাছ ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিতেই সেটা সব শুদ্ধু উঠে এলো মাটি থেকে।

সুজয় কখনো গাছের একটা পাতা পর্যন্ত ছেঁড়ে না। গাছকে কষ্ট দিতে তারও কষ্ট হয়। কিন্তু এই গোলাপ গাছটার শেকড় কাটা।

গাছটা তুলে ফেলে তার শেকড়ের কাছটার গর্তে হাত ঢোকালো

সুজয়। সে যা ভেবেছিল তাই। সেখানে রয়েছে সুজয়ের দাদুর চাবির গোছা।

সঙ্গে সঙ্গে পেছনে একটা পায়ের শব্দ পেয়েই সুজয় ঘাড় ঘুড়িয়ে তাকালেন। সে দেখতে পেল একটা সাদা কেড্‌স জুতো। তারপর খাঁকি প্যান্ট। এই সেই রজত।

রজত সুজয়কে মারবার জন্য একটা হাত তুলেছিল, তার আগেই সুজয় চেঁচিয়ে উঠলো, অভিজিৎ, অভিজিৎ! আমি চাবি খুঁজে পেয়েছি। রজত থমকে দাঁড়ালো। তারপরই পেছন ফিরে লাগালো দৌড়। এরপর রজতকে আর দেখতেই পাওয়া যায় নি।

অভিজিৎ কাছে এসে বললো, চাবি? দেখি, দেখি! সত্যিই তো! তুই কী করে পেলি?

সুজয় বললো, এমনি, আমার পায়ে হঠাৎ হোঁচট লাগলো। আমি দেখলাম, একটা চাবির গোছা—।

তারপর সুজয় মন দিয়ে সেই গোলাপ গাছটাকে আবার পুঁতে দেবার চেষ্টা করতে লাগলো। সত্যি কথা তো বলে লাভ নেই, কেউ বিশ্বাস করবে না।

তুষ্টু

প্রথম যখন এলো এ বাড়িতে, তখন ওর মাত্র দেড় মাস বয়েস। ফুটফুটে চেহারা, জুলজুলে চোখ। যখন এদিক ওদিক দৌড়োয়, তখন মনে হয় ঠিক একটা সাদা বল গড়ালো মাটির ওপর দিয়ে। দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে।

পুপলুই ওর নাম রাখলো তুষ্টু। ও পুপলুর নিজস্ব কুকুর। পুপলুর বাবা তেমন ভালোবাসেন না কুকুর, তিনি প্রথমে আপত্তি করেছিলেন একটু। কিন্তু পুপলুর মায়ের ইচ্ছে, বাড়িতে একটা কুকুর থাকে। পুপলুর সঙ্গে খেলা করবে।

কয়েকদিনের মধ্যেই তুষ্টু সকলের মন কেড়ে নিল। সব সময় পায়ে পায়ে ঘোরে আর ভুক ভুক করে ডাকে। কী মিষ্টি ওর ডাকটা। ছোট্ট ছোট্ট দাঁত দিয়ে কুটুস কুটুস করে কামড়ে দেয়, তাতে কিন্তু একটুও লাগে না।

তিন মাস বয়সের সময়ও তুষ্টু তেমন বড় হলো না। প্রায় একই রকম চেহারা। শুধু গলার আওয়াজটা একটু গম্ভীর হয়েছে। বারান্দায় কাক বসলেই সে ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে যায়। কাকগুলোও ভারি চালাক। তারা বারান্দার এক পাশ থেকে উড়ে গিয়ে আর এক পাশে বসে। কাকেরা তুষ্টুকে ভয় পায় না, তারা ওকে নিয়ে খেলা করে।

সকালবেলা পুপলু যখন ইস্কুলে যায়, সেই সময় দারুন ছটফট করে তুষ্টু। সে কিছুতেই থাকতে চায় না। সে বুঝতেই পারে না, পুপলু তাকে ছেড়ে একলা কোথায় চলে যাচ্ছে। তখন তুষ্টুকে জোর করে ধরে রাখতে হয়। এক একদিন সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায় অনেকটা।

সাড়ে তিনমাস বয়েসের সময় তুষ্টু একদিন পালালো বাড়ি থেকে। পুপলু ইস্কুলে চলে গেছে, পুপলুর বাবা বেড়িয়ে গেছেন অফিসে, মা রান্নাঘরে। এই সময় বাড়ির ঠিকে ঝি সদর দরজা খোলা রেখেছিল, তুষ্টু টুক করে বেরিয়ে গেল।

অনেক্ষণ কেউ খেয়ালই করে নি। পুপলু বারোটার সময় তুষ্টুর খাবার দিতে গিয়ে তুষ্টুকে খুঁজে পেলো না। রেফ্রিজারেটারের তলাটাই তুষ্টুর লুকোবার প্রিয় জায়গা। সেখানে নেই, বারান্দায় নেই, ছাদে নেই। তা হলে কোথায় গেল?

পুপলুর মা ঠিকে ঝিকে বললেন, দেখে এসো তো, সিঁড়ির নীচে বসে আছে কি না?

সেখানেও নেই তুষ্টু!

পুপলুর মা দারুণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তারপর ঠিকে ঝিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নিজেই বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়। একেবারে মোড়ে পানের দোকানের সামনে তিনি দেখলেন একটা ভিড় জমে আছে। কাছে এসে তিনি দেখতে পেলেন তুষ্টুকে।

সারা গায়ে সাদা সাদা বড় বড় লোম, ছোট্ট খাট্টো কুকুর, তবু তার কী তেজ! তিনটে রাস্তার কুকুর ঘিরে ধরেছে, তারই মাঝখানে লোম ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করে ভয় দেখাচ্ছে তুষ্টু। লোকেরা মজা দেখছে।

পুপলুর মা এসে বললেন, এই তুষ্টু!

রাস্তার লোকেরা বললো, এটা আপনাদের কুকুর? তাই বলুন! দেখেই মনে হয়েছিল এটা কারুর বাড়ির পোষা কুকুর।

পুপলুর মা হাত বাড়িয়ে তুষ্টুকে কোলে তুলে নিতে গেলেন। কিন্তু তুষ্টুটা এমন পাজী, সে এক লাফ মেরে খানিকটা দূরে সরে গেল। তারপর দৌড়াতে লাগলো পাশের রাস্তা দিয়ে!

লোকেরা চেঁচিয়ে উঠলো, ধর, ধর!

কিন্তু তুষ্টু চলে যেতে লাগলো আরও দূরে। পুপলুর মা তো

আর কুকুরের পেছনে পেছনে ছুটতে পারবেন না। তিনি কোনভাবে দাঁড়িয়ে পড়লেন এক জায়গায়। দুষ্টুটা রাস্তার মাঝখান দিয়ে ছুটছে, যে কোনো সময় গাড়ি চাপা পড়তে পারে।

শেষ পর্যন্ত, পাড়ার দরজির দোকানের একটা ছেলে পাঁই পাঁই করে ছুটে গিয়ে খপ্ করে ধরে ফেললো দুষ্টুকে। দুষ্টু দু' তিনবার কামড়ে দিল তাকে, কিন্তু ছেলেটি ছাড়লো না!

পুপলুর মা ওকে কোলে তুলে নিয়ে বকুনি দিয়ে বললেন, দাঁড়া আজ তোকে এমন মারবো!

দুষ্টু যেন তখন আর কিছুই জানে না। আদুরে গলায় ডাকতে লাগলো, কুঁই, কুঁই!

সেদিন থেকে দুষ্টুর জন্য কেনা হলো বাক্‌লস আর চেন। মাঝে মাঝে তাকে বেঁধে রাখা হয়। কিন্তু বাঁধা থাকাটা সে একদম পছন্দ করে না, চ্যাচায় অনবরত। সেই চ্যাচানি শুনে পুপলুর বাবা বিরক্ত হন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে খুলে দেন দুষ্টুকে।

সাড়ে পাঁচ মাস বয়েসের সময় দুষ্টু হঠাৎ বড় হয়ে উঠলো। এখন তার সামনে কোনো খাবার দেখালে সে ভাল্লুকের মতন দু'পায়ে উঁচু হয়ে দাঁড়ায়। যখন তখন সিগারেটের প্যাকেট আর কাগজ মুখে নিয়ে পালায়। অনেক কথা বোঝে। কিন্তু বুঝেও শোনে না অনেক কথা। সবাই বলে তার দুষ্টু নামটা সার্থক।

বাইরের লোক এলেই দুষ্টু খুব জোরে জোরে ডেকে তেড়ে যায়। অনেকে ভয় পায়। পুপলুর মামাতো বোন টুয়া আর এ বাড়িতে আসতেই চায় না। পুপলুর বন্ধু রাজন বলে, আগে ভাই তোমার কুকুর বেঁধে রাখো, তারপর তোমার সঙ্গে খেলবো।

একদিন পুপলুর ঘাড়ের কাছে দেখা গেল তিনটে লম্বা দাগ। সেখান থেকে কত রক্ত বেরিয়ে জমে আছে।

পুপলুর মা আঁতকে উঠে বললেন, ওমা, পুপলু, তোর ঘাড়ের কাছে ওরকম ভাবে কাটলো কী করে?

পুপলুর বাবা বললেন, এ তো মনে হচ্ছে, দুষ্টু কামড়েছে !

পুপলু বললো, না, না, এমনি কেটে গেছে।

—এমনি এমনি ঘাড়ের কাছে কেটে যায় ?

—হ্যাঁ, ছাদে খেলতে গিয়ে একটা তারের খোঁচা লেগেছিল।

পুপলুর বাবা আর মা দু'জনেই বুঝে গেলেন যে, ওটা আসলে দুষ্টুরই কামড়ানোর দাগ। পুপলুর তার নিজের কুকুরের দোষ চাপা দিতে চাইছে।

পুপলুর ঘাড়ে লাগিয়ে দেওয়া হলো ডেটল। আর খুব বকুনি দেওয়া হলো দুষ্টুকে। বকুনি খেয়েই সে রেফ্রিজারেটরের তলায় লুকিয়ে পড়লো।

এর পর একদিন সে কামড়ে দিল পুপলুর বাবাকেই। দুষ্টু একটা মাংসের হাড় নিয়ে এসেছিল পড়বার ঘরে, পুপলুর বাবা সেটি সরিয়ে নিতে যেতেই দুষ্টু ঘ্যাঁক করে কামড়ে দিল তার পায়ে। রক্ত বেরোয় নি অবশ্য. কিন্তু পুপলুর বাবা রেগে গিয়ে একটা খবরের কাগজ পাকিয়ে খুব করে মারলেন তাকে ! পুপলু ছুটে এসে বললো, বাবা, ওকে আর মেরো না, আর মেরো না ! ও তো ছোট, তাই বোঝে না।

এবার সে কামড়ালো পুপলুর মাকে। তিনি ওকে চান করিয়ে দিচ্ছিলেন। সাদা সাদা লোমগুলো ময়লা হয়ে গেছে। সাবান মাখিয়ে দিলে চকচকে ঝকঝকে হয়ে যায়। সেই সাবান মাখাতে যেতেই সে খুব জোরে কামড়ে দিল পুপলুর মাকে। রক্ত বেরিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

সেদিন বিকেলবেলা দুষ্টু যেই পুপলুর মায়ের সঙ্গে খেলা করতে এসেছে, অমনি তিনি রাগ করে বললেন, যা তুই যা এখান থেকে তোর সঙ্গে আর কথা বলবো না।

দুষ্টু অমনি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে নানারকম খেলা দেখাতে লাগলো। সে এমন মজার ভঙ্গি করতে লাগলো যে দেখলে না হেসে

পারা যায় না। পুপলুর মা বারবার বলতে লাগলেন, যা, বেরিয়ে যা এ ঘর থেকে। সে কিছুতেই যাবে না।

পরদিনই সে কামড়ে দিল ডিমওয়ালাকে।

তারপর দিন নীচের তলার একটা বাচ্চা মেয়েকে।

তারও পরের দিন পিওনকে।

দুষ্টুকে নিয়ে আর পারা যায় না। সে যখন তখন যাকে তাকে তাড়া করে যায় কিংবা কামড়ায়। যদিও তাকে সব রকম ইঞ্জেকশন দেওয়া আছে, কারুর কোনো ক্ষতি হবে না, কিন্তু অনেকেই ভয় পেয়ে যায়। আবার অন্য সময় সে এমন ভালো হয়ে থাকে। এমন সব মজার মজার খেলা করে যে তখন তাকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে খুব। কামড়ে দেওয়াটাও যেন তার খেলা। বিশেষত বাড়িতে কোনো বাচ্চা ছেলে মেয়ে এলে সে কামড়াতে যাবেই। পুপলুর বন্ধুদেরও সে তেড়ে যায়। সে চায়, পুপলু শুধু তার সঙ্গেই খেলা করবে। আর কারুর সঙ্গে নয়।

এরপর একদিন সে পাশের ফ্ল্যাটের দিদিমাকে কামড়ে দিতেই সবাই চটে গেল খুব। পুপলুর মা কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেউ এই কুকুরটা নেবে?

অনেকেই রাজি। একজন তো বললো, এমন সুন্দর কুকুরটা দিয়ে দেবেন? আমি এক্ষুনি নিতে রাজি আছি।

পুপলুর মা বললেন, নিয়ে যাও!

কিন্তু পুপলু তখন বাড়িতে। সে এসে এমন চ্যাঁচামেচি করে কান্নাকাটি জুড়ে দিল যে আর দেওয়া গেল না।

পরদিন সে আবার পুপলুর মাকে কামড়ালো।

আর এ কুকুর রাখা যায় না। সেদিন সকালে পুপলু স্কুলে গেছে, সে সময় একজন চেনা লোক এলো। পুপলুর মা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এই কুকুরটা নেবে? সে তক্ষুনি রাজি। এত ভালো জাতের কুকুর কিনতে গেলে অনেক পয়সা লাগে। বিনা পয়সায় পেয়ে সে খুব খুশী।

সত্যিই সে তুষ্টুকে নিয়ে চলে গেল।

পুপলুর স্কুল থেকে ফেরার সময় হলেই তুষ্টু বসে থাকতো দরজার সামনে। পুপলু এলেই লাফিয়ে পড়ত তার গায়ে। তখন থেকেই শুরু হতো খেলা। সেদিন তুষ্টুকে না দেখে পুপলু বললো, মা তুষ্টু কোথায় ?

মা বললেন, সে চলে গেছে। হারিয়ে গেছে।

পুপলু বললো, না হারিয়ে যায়নি। তোমরা নিশ্চয় কাউকে দিয়ে দিয়েছো। কেন দিয়েছো ?

মা বললেন, ছাখ, আজ আমার হাতে আবার কতটা কামড়ে দিয়েছে।

পুপলু তবু মানলো না। সেদিন সে খেল না। খেলতে গেল না। কাঁদতে কাঁদতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো।

পুপলুর মায়েরও মনটা খারাপ হয়ে গেছে বেশ। এতদিন ধরে পুষলে মায়া পড়ে যায়। কত কথা মনে পড়ছে।

রাত্তিরবেলা অফিস থেকে ফিরে পুপলুর বাবা বললেন তুষ্টু কোথায় ? তারপর নিজেই আবার বললেন, ও তাকে তো দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বড় খালি খালি লাগছে বাড়িটা।

মা বললেন, পুপলুর খুব মন খারাপ হয়ে গেছে। কিছু খেল না।

বাবা বললেন, আমারও তো মন খারাপ লাগছে।

মা বললেন, ফিরিয়ে আনবো নাকি ? যে নিয়ে গেছে, সে যোধপুর পার্কে থাকে। বাড়িটা চিনি না।

বাবা বললেন থাক, আর ফিরিয়ে আনবার দরকার নেই।

সেদিন রাত্রে খাওয়া দাওয়া করে সবাই শুয়ে পড়েছে, এমন সময় খট খট করে দরজায় একটা শব্দ। এত রাত্রে কে এলো ? দরজা খুলতেই তুষ্টু এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো বাবার ওপর। ডাকতে লাগলো কুঁই কুঁই করে।

পুপলু পর্যন্ত ঘুম থেকে উঠে এসেছে। সবাই অবাক, সঙ্গে আর

কেউ নেই। অতদূর যোধপুর পার্ক থেকে টুষ্টু কী করে চলে এলো রাস্তা চিনে ?

মা বললেন, টুষ্টু, তুই আবার এসেছিস ?

টুষ্টু মায়ের ওপর গিয়ে লুটোপুটি খেতে লাগলো। যেন সে ক্ষমা চাইছে। পুপলু তাড়াতাড়ি তাকে কোলে তুলে নিয়ে ছুটে চলে গেল নিজের ঘরে।

আশ্চর্য, তারপর থেকে আর একদিনও টুষ্টু কাউকে কখনো কামড়ায় নি।

পানিমুড়ার কবলে

আমাদের বাড়ির পেছনে একটা মস্ত বড় পুকুরের ওপাশে একটু একটু জঙ্গল শুরু হয়ে গেছে। সেই জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় মুসলমানদের একটা কবরখানা। তারপর থেকে বেশ ঘন জঙ্গল।

সে বছর আমার বাবা কলকাতা থেকে ট্রান্সফার হয়ে গেলেন আলিপুর দুয়ার। আমাদের বাড়ি পাওয়া গেল শহর ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে। বছরের মাঝখানে আমাকে চলে আসতে হলো বলে এখানকার স্কুলে আমি ভর্তি হতে পারলাম না। নতুন বছরে ভর্তি হতে হবে।

তাই দুপুরবেলা আমার কিছুই করার থাকে না। বাবা অফিস চলে যান, মা খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়েন। আমার একদম ঘুমোতে ইচ্ছে করে না দুপুরে। একটাও নতুন গল্পের বই নেই, আর পড়ার বই তো বেশীক্ষণ ভালো লাগে না পড়তে। তাই আমি চুপি চুপি বাড়ির পেছনে পুকুরটার পাড়ে চলে যাই।

একা একা জঙ্গলে যেতে আমার ঠিক সাহস হয় না। এখানকার জঙ্গলে বাঘ আছে, কিন্তু আমার তো বন্দুক নেই। আমার তীর ধনুক আছে অবশ্য, তা দিয়ে বাঘ মারা যায় না। তবু আমি জঙ্গলের মধ্যে একটু একটু গেছি দুএকবার। কিন্তু ঐ কবরখানাটার পাশ দিয়ে যেতেই বেশি গা ছম ছম করে। বাবার অফিসের পিওন মুনাব্বর খাঁ বলেছিল, ঐ কবরখানায় নাকি ভূত আছে।

আমি এদিক ওদিক তাকাই, কখনো ভূত দেখতে পাই না। কিন্তু কী রকম যেন একটা বোঁটকা গন্ধ পাই। আর থাকতে ইচ্ছে করে না, এক ছুটে ফিরে আসি। আমার যদি আর একটা বন্ধু থাকতো, তা হলে নিশ্চই আমরা দুজনে মিলে ভূত দেখার চেষ্টা করতাম। কিন্তু

এখানে এসে এখনো যে আমার কোনো নতুন বন্ধু হয়নি। একা একা ভূত দেখতে যেতে বড্ড খারাপ লাগে।

আমি তাই পুকুরটার ধারে গিয়ে বসে থাকি। ছোট ছোট ইঁটের টুকরো বা পাথর ছুঁড়ে মারি জলের মধ্যে।

পুকুরটা বিরাট বড়, আর এখন বর্ষাকাল বলে কানায় কানায় ভরা। দুপুরবেলা পুকুরটা দেখলে খুব গম্ভীর মনে হয়। কোথাও কোন লোকজন নেই, আমি শুধু একা।

এক এক সময় আমার মনে হয়, আমাকে যেন কেউ দেখছে। যদিও কোথাও আর কেউ নেই, তবু যেন মনে হয়, আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে কেউ আমাকে লক্ষ্য করছে। আমি মাথা ঘুরিয়ে চারিদিক চেয়ে দেখি, আর কাউকে দেখতে পাই না।

এই পুকুরটায় বেশ মাছ আছে। মাঝে মাঝে তারা ঘাই মারে, অমনি জলের ওপর গোল গোল ঢেউ ওঠে। কিন্তু একদিন হঠাৎ দেখলাম, পুকুরের ঠিক মাঝখানটায় জল ফুলে ফুলে উঠছে। যেন ঠিক ঐখানটায় কোন বিরাট কিছু প্রাণী দাপাদাপি করছে। এত বড় তো মাছ হতে পারে না। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না।

তারপর থেকে আমি সবসময় পুকুরের মাঝখানটায় তাকিয়ে থাকি। কিন্তু আর কিছু দেখা যায় না। আবার পুকুরটা শান্ত আর গম্ভীর!

পুকুরের ঘাটটা অনেক দিনের পুরোনো। পাথর দিয়ে তৈরী, কিন্তু কয়েক জায়গায় ভেঙে ভেঙে গেছে। সেই ভাঙা জায়গাগুলোয় গর্ত হয়ে সেখানে জল জমে থাকে, সেই জলেও ছোট ছোট মাছ দেখা যায়।

আমি ঘাটের কাছে এসে সেই মাছগুলো ধরার চেষ্টা করি। আমার তো বঁড়শী নেই, আর বঁড়শী দিয়ে আমি মাছ ধরতেও জানি না। তাই হাত দিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করি। এক ধরনের মাছ, জলের তলায় মাটিতে চুপচাপ শুয়ে থাকে। ওগুলোর নাম বেলে মাছ। সেই মাছগুলো আমাকে কাছাকাছি দেখেও ভয় পায় না।

মাছগুলো অবশ্য দারুণ চালাক। আমি আস্তে আস্তে জলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে ওদের ধরার চেষ্টা করি, ওদের একেবারে গায়ের কাছে হাত দেবার পর সুড়ুৎ করে পালিয়ে যায়। পাথরের তলার মধ্যেও অনেকখানি গর্ত আছে, সেইখানে লুকিয়ে পড়ে।

মাছ ধরার ঝোঁকে আমি জলের মধ্যে নেমে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় কে যেন ডাকলো, এই বাবলু !

আমি চমকে উঠলাম, সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি কেউ নেই তো ! তাহলে আমায় কে ডাকলো ? স্পষ্ট শুনলাম, অনেকটা ঠিক আমার মায়ের মতন গলা। মা তো ঘুমোচ্ছেন, তাহলে কে ডাকলো। খুব কাছ থেকে ! মা-ই কি আমাকে ডেকে চট্ করে কোথাও লুকিয়ে পড়লেন।

জল থেকে উঠে এসে আমি ঘাটের চারপাশে খুঁজলাম। কেউ নেই। কাছেই একটা মস্ত কদম ফুলের গাছ, সেখানে কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে। তাও নেই।

অমনি আমার খুব ভয় করতে লাগলো। কেউ কোথাও নেই, তাহলে আমায় ডাকলো কে ? আমি যে স্পষ্ট শুনেছি !

দৌড়ে চলে এলাম বাড়িতে। দোতলায় এসে দেখলাম, মা অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। আমি তবু মাকে ডেকে তুলে জিজ্ঞেস করলাম, মা, তুমি কি এই মাত্র পুকুর ঘাটে গিয়েছিলে ?

মা তো খুব অবাক। বিছানার উপর উঠে বসে বললেন, কেন, পুকুরঘাটে যাবো কেন ? তুই বুঝি গিয়েছিলি ?

আমি বললাম হ্যাঁ। আমি সেখানে খেলা করছিলাম, মনে হলো পেছন থেকে কে আমাকে ডাকলো। ঠিক তোমার মতন গলা।

মা বললেন, তুই বানিয়ে বানিয়ে এসব কথা বলছিস !

—না, মা ! আমি স্পষ্ট শুনলাম।

মা রেগে গিয়ে বললেন, তুই কেন পুকুরঘাটে গিয়েছিলি একলা একলা ? দুপুরবেলা কেউ একলা যায় ?

—কেন, কী হয় তাতে ?

—না, কক্ষনো দুপুরে একলা জলের ধারে যেতে নেই! আর কোনদিন যাবি না। তোর পড়াশুনো নেই।

—পড়াশুনো তো হয়ে গেছে!

—তা হলেও যাবি না! খবরদার।

মা আমাকে টেনে নিয়ে তার পাশে শুইয়ে দিলেন। পুকুর ধারে যে কেউ আমার নাম ধরে ডেকেছে, মা একথা বিশ্বাসই করলেন না।

বাবার অফিসের পিওন মুনাব্বর খাঁ প্রায়ই সন্ধেবেলা আমাদের বাড়িতে আসে। কী সব অফিসের কাজ নিয়ে। মুনাব্বর খাঁ খুব দারুণ দারুণ গল্প বলতে পারে। সে-ই তো আমাকে কবরখানার ভূতের তিনটে গল্প বলেছিল।

সেদিন সন্ধেবেলা আমি মুনাব্বর খাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। এই পুকুরটার মধ্যে কত বড় মাছ আছে বলো তো? তুমি জানো?

মুনাব্বর খাঁ জিজ্ঞেস করলেন, কেন বলো তো খোকাবাবু?

আমি বললাম, একদিন দুপুরবেলা আমি দেখেছিলাম পুকুরের ঠিক মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড জিনিস জলের মধ্যে দাপাদাপি করছিল। সেটা যদি মাছ হয়, তাহলে নিশ্চয়ই সেটা এই ঘরের সমান হবে।

মুনাব্বর খাঁ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর বললো, খোকাবাবু, দুপুরবেলা পুকুরধারে কক্ষনো একলা যেও না। যেতে নেই।

—কেন, গেলে কী হয়?

—অনেক রকম বিপদ হয়। তুমি জানো না, এই সব পুরোনো পুকুরে পানিমুড়া থাকে?

—পানিমুড়া কী!

—পানিমুড়া জানো না? পানিমুড়া হচ্ছে জলের ভূত!

—ধ্যাৎ! জলের মধ্যে আবার ভূত থাকে নাকি?

—ওমা, তুমি পানিমুড়ার কথা শোনো নি? এতো সবাই জানে।

পানিমুড়া বড়দের কিছু বলে না। কিন্তু ছোটদের জলের তলায় টেনে নিয়ে যায়।

—মুনাব্বর খাঁ, তুমি পানিমুড়া দেখেছ?

—হ্যাঁ, তিনবার দেখেছি। তাদের মাথাটা হয় কুমীরের মতন, আর গা-টা মানুষের মতন। এই সব পুকুর জানো তো, খুব পুরোনো, আগেকার দিনের রাজাদের আমলের। এই সব পুকুরের মাঝখানে গাদ্দি থাকে।

—গাদ্দি কী?

—গাদ্দি মানে সুড়ঙ্গ। সেই সুড়ঙ্গ চলে গেছে অনেক দূরে, একেবারে পাতাল পর্যন্ত। যারা পানিতে ডুবে মরে, পানিমুড়া ভূত হয়ে যায়, ঐ সুড়ঙ্গের মধ্যে থাকে। মাঝে মাঝে ওপরে উঠে আসে। পানিমুড়াদের সঙ্গে আবার কবরখানার ভূতদের খুব ঝগড়া। পানিমুড়ারা ওপরে উঠে এলেই কবরখানার ভূতরা তাদের তাড়া করে যায়। আমি একবার দেখেছিলাম একটা পানিমুড়া আর একটা কবরখানার ভূত খুব ঝটাপটি করে লড়াই করছে!

এই সময় মা এসে জিজ্ঞেস করলেন, কিসের গল্প হচ্ছে?

আমি বললাম, মা, তুমি পানিমুড়া ভূত দেখেছো কখনো? মুনাব্বর খাঁ দেখেছে!

মা বললেন, বসে বসে বুঝি ভূতের গল্প হচ্ছে এই সন্ধেবেলা! মুনাব্বর, তুমি বাবলুকে বানিয়ে বানিয়ে ওসব গল্প বলো না। ভূত বলে আবার কিছু আছে নাকি? কিছু নেই! ভূত হচ্ছে মানুষের কল্পনা।

মুনাব্বর বললো, না, মেমসাব! আমি নিজের চক্ষে দেখেছি।

মা হেসে বললেন, ছাই দেখেছো!

আমার মায়ের খুব সাহস। মা একদিন রাত্তিরবেলা একা একা কবরখানায় গিয়েছিলেন ভূত দেখার জন্য। কিচ্ছু দেখতে পাননি। মাকে দেখে ভূতেরা ভয় পেয়েছিল। বাবা বলেছিলেন তোমার হাতে

টর্চ ছিল তো, সেই আলো দেখে ভূতেরা পালিয়ে গেছে। তুমি অন্ধকারে একবার গিয়ে দেখো তো!

মা বলেছিলেন, ওখানে অনেক সাপখোপ আছে। অন্ধকারে গেলে যদি সাপে কামড়ায়? আমি ভূতের ভয় পাই না, কিন্তু সাপকে ভয় করি।

দু'তিন দিন আমি আর পুকুর ধারে যাইনি। কিন্তু আমার মন ছটফট করে। দুপুরবেলা কি শুয়ে থাকতে ভালো লাগে কারুর। মা ঘুমিয়ে পড়েন, আমার যে ঘুম আসে না! পড়া গল্পের বইগুলিই আরও কয়েকবার করে পড়তে লাগলাম।

তারপর আবার একদিন, মা ঘুমিয়ে পড়ার পর আমি চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লাম আবার। আজ আমার সঙ্গে একটা ছোট লাঠি। যদি ভূত-টুত আসে তাহলে লাঠি দিয়ে মারবো।

পুকুরের কাছে এসে দেখি, ঘাটের ওপর একটা লোক বসে আছে। লোকটার গায়ে একটা লাল রঙের ডোরাকাটা গেঞ্জি আর মাথায় এমন টাক যে একটাও চুল নেই। লোকটা জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে বসে জলে ঢেউ তুলছে। সারা গা ভেজা। লোকটা এলো কোথা থেকে? আমাদের এই পুকুরে তো বাইরের কোনো লোক স্নান করতে আসে না!

আমি খুব কাছে চলে আসার পর লোকটি পেছন ফিরে তাকিয়ে আমাকে দেখলো। দেখেই যেন দারুণ ভয় পেয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে এক লাফ মেরে জলের মধ্যে গিয়ে পড়লো। তারপর ডুবে গেল।

আমিও খুব অবাক হয়ে গেলাম। লোকটা আমাকে দেখে ওরকম ভয় পেল কেন? আমার হাতের লাঠিটা দেখে?

চোর-টোর নয় তো? যদি চোর হয়, লোকটা তাহলে সাঁতার কেটে পুকুরের ওপাশে উঠে জঙ্গল দিয়ে পালাবে।

আমি জলের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কিন্তু লোকটা সেই যে ডুব দিয়েছে, আর উঠছে না। এতক্ষণে

কেউ ডুব দিয়ে থাকতে পারে। আমি মনে মনে এক দুই তিন করে পাঁচশো পর্যন্ত গুনে ফেললাম, তবু লোকটাকে আর দেখা গেল না। এই রে, লোকটা মরে গেল না তো? আমাকে দেখে ভয় পেয়ে জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়েছে, হয়তো লোকটা সাঁতারই জানে না।

তা হলে কি এক্ষুনি ছুটে গিয়ে লোকজন ডাকা উচিত? কিন্তু আমার কথা যদি কেউ বিশ্বাস না করে? আরও একটুক্ষণ দেখবার জন্য আমি জলের পাশে এসে দাঁড়ালাম। তখন আমার মনে হলো, ওটা ভূত নয় তো? ও-ই কি পানিমুড়া? কিন্তু একদম মানুষের মতন দেখতে। মুনাব্বর খাঁ যে বলেছিল, পানিমুড়ার মুখটা কুমীরের মতন! এ যে একদম মানুষের মতন। শুধু টাক মাথা। শুধু তাই নয়, লোকটা যখন আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে ছিল তখন দেখেছি, ওর চোখের ওপর ভুরুও নেই। সারা গায়ে কোনো লোমও নেই। মুনাব্বর নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলেছিল। সে পানিমুড়া কোনদিন দেখেনি।

তক্ষুনি ফিরে গিয়ে মাকে খবর দেবো ভাবছি, এক সময় জলের মধ্যে একটা হাত উঁচু হয়ে উঠলো। শুধু একটা হাত। আমি ভাবলাম, লোকটা এবার উঠে আসবে। তা বলে পানিমুড়া নয়। কোনো চোরই নিশ্চয়ই।

শুধু হাতটাই উঁচু হয়ে রইলো, আর কিছু না। লোকটার মাথাও দেখা গেল না। তারপর মনে হলো, সেই হাতটা যেন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সেই হাতে লম্বা লম্বা আঙুল, তাতে বিচ্ছিরি নোখ। হাতটা ক্রমশ ঘাটের দিকে এগিয়ে আসছে।

হাতটা ঘাটের অনেক কাছে এসে আঙুল নাড়তে লাগলো। ঠিক যেন আমায় ডাকছে।

আমি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে?

তখন দেখলাম, জলের মধ্যে দুটো চোখ, আমার দিকে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টে। চোখ দুটো মাছের মতন, পলক পড়ে না। কিন্তু মাছের নয়, চোখ দুটো সেই লোকটার! আমার একবার ইচ্ছে হলো,

পালিয়ে যাই।

আবার ভাবলাম, দেখি না শেষ পর্যন্ত কী হয়। আমার তো হাতে লাঠি আছে

এবার সেই হাতটা খুব কাছে চলে এলো। মনে হলো যেন আমার পা চেপে ধরবে। এই সময় কে যেন পেছন থেকে আমার নাম ধরে ডাকলো, বাবলু! বাবলু!

কিন্তু তখন আমার পেছনে তাকাবার সময় নেই। আমি লাঠি দিয়ে খুব জোরে মারলাম সেই হাতটার ওপর। ঠিক লাগলো কিনা বুঝতে পারলাম না, হাতটা জলের মধ্যে ডুবে গেল।

আবার কেউ আমার নাম ধরে ডাকলো, বাবলু, বাবলু!

পেছন দিকে তাকিয়ে দেখলাম কেউ নেই। সামনে জলের ওপর সেই হাতটা আবার উঁচু হয়ে উঠেছে।

আমি লাঠি দিয়ে যেই আবার মারতে গেলাম, অমনি সেই হাতটা লাঠিখানা চেপে ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিল, আমি ঝপাং করে জলের মধ্যে পড়ে গেলাম।

জলে পড়েই মনে হলো, আমি আর বাঁচবো না। আমি যে সাঁতার জানি না! পানিমুড়া আমার পা ধরে সুড়ঙ্গে টেনে নিয়ে যাবে। আমি একবার চেঁচিয়ে উঠলাম, ওমা—! মা!

জলের মধ্যে আমি হাবুডুবু খেতে লাগলাম। দম আটকে আসছে। পানিমুড়া এখনো আমার পা ধরেনি। আমি ছটফট করছি বলে খুঁজে পাচ্ছে না বোধ হয়।

এরই মধ্যে একবার কোনো রকমে জল থেকে একটু মাথা উঁচু করে দেখলাম, মাঠ দিয়ে ছুটে আসছেন আমার মা। আমি চিৎকার করতে চাইলাম, মা—কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বেরুলো না। আমি তলিয়ে যেতে লাগলাম। মা পাড় থেকেই এক লাফ দিয়ে জলে পড়লেন।

চোখ মেলে দেখলাম, আমি আমাদের বাড়ির বাইরের ঘরে শুয়ে আছি। মা আর আমাদের রাঁধুনি আমার গায়ে গরম জলের

সেঁক দিচ্ছে। আমি চোখ মেলতেই মা বললেন, আমি বলেছিলাম না, ওর পেটে বেশি জল ঢোকেনি। এই তো সব ঠিক হয়ে গেছে!

মা ঠিক সময়ে গিয়ে না পড়লে কী যে হতো, ভাবতেও আমার আজও গা কাঁপে। মা ওখানে গেছেন কি করে সেটাও একটা আশ্চর্য ব্যাপার। পরে শুনেছি সে কথা। মা ঘুমিয়ে ছিলেন, এমন সময় তাঁর কানের কাছে কে যেন ডাকলো মা, মা,! ঠিক আমার গলা। মা চোখ মেলে দেখলেন, কেউ নেই। তিনি বিছানায় উঠে বসলেন। তখন বাইরে থেকে আবার সেই মা মা ডাক শোনা গেল। তারপর পুকুর ঘাট থেকে।

আমি জলে পড়ার সময় মা মা বলে ডেকেছিলাম ঠিকই। কিন্তু এত দূর থেকে মায়ের তো সেটা শুনতে পাওয়ার কথা নয়। তবু মা শুনতে পেয়েছিলেন।

মা আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললেন, বাবলু, তোকে আমি একা একা পুকুর ঘাটে যেতে বারণ করেছিলাম, তবু গেলি কেন? কেন জলে নেমেছিলি?

আমি বললাম, মা, আমাকে পানিমুড়া টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো।

মা বললেন, বাজে কথা।

আমি বললাম, না সত্যি!

মা বললেন, মোটেই না! তুই পা পিছলে জলে পড়ে গিয়েছিলি!

মা কিছুতেই পানিমুড়ার কথা বিশ্বাস করলেন না। আমাদের রাঁধুনি বললো, হ্যাঁ গো দিদি, এসব পুরোনো পুকুরে অনেক ভয়ের জিনিস থাকে।

মা বললেন, সাঁতার না জানলে লোকে জল দেখে ওরকম অনেক ভয়ের জিনিস বানায়। আমি কাল থেকেই বাবলুকে সাঁতার শেখাবো।

এরপর সাতদিনের মধ্যে আমি সাতার শিখে গেলাম। পানিমুড়াকে আর কখনো দেখিনি! তবে আমি সাঁতার কাটতে যেতাম নদীতে, ঐ পুকুরে আর নয়।

ভালোবাসা

তপনের আজকাল প্রায়ই মন খারাপ থাকে। প্রায়ই সে একা একা দাঁড়িয়ে থাকে জানালায়, অথবা ছাদে উঠে ঘুরে বেড়ায়, আর মনে হয়, পৃথিবীতে আমাকে কেউ ভালবাসে না।

তা যদিও সত্যি নয়, বাবা-মা তাকে খুব ভালবাসে, আর ছোট মাসী তো এলেই তাকে কত আদর করেন। দাদা তাকে মাঝে মাঝে খুব বকুনি দেয় বটে—দাদার বই পত্তরে হাত দিলে দাদা খুব চটে যায়—কিন্তু দাদাও তো তাকে চকলেট কিনে দেয়, ঘুড়ি কেনার পয়সা দেয়। আর তাদের বাড়ির বুড়ো চাকর বেচারাম তো তপনের সব কথা শোনে। তবুও যে তপনের কেন মনে হয়, আমাকে কেউ ভালবাসে না!

গত মাসে তপন তের থেকে চৌদ্দ বছরে পা দিয়েছে। হঠাৎ কি রকম তাড়াতাড়ি সে লম্বা হয়ে যাচ্ছে, এখন সে মায়ের চেয়েও লম্বা। গত বছর পূজোর সময় কেনা জামা এখন তার ছোট হয়। গলার আওয়াজটাও কি রকম ভাঙা ভাঙা আর মোটা হয়ে গেছে, নিজের গলা বলে চেনাই যায় না।

এখন আর সে মা-বাবার সঙ্গে এক বিছানায় শোয় না। মা তাকে বলেছিলেন, দাদার সঙ্গে শুতে কিন্তু তপন রাজি হয় নি। দাদা ঘুমের মধ্যে যা লাথি মারে! এখন তপনের আলাদা খাট। এক একদিন মাঝ রাত্রিতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে তপনের কি রকম ভয় ভয় করে। না, তপন ভূতের ভয় পায় না। সায়েন্স বইতে সে পড়েছে, ভূত বলে কিছু নেই। কিন্তু ঘুম ভাঙার পর মনে হয়, সমস্ত পৃথিবীটা কি অসম্ভব চুপ চাপ, একটা কুকুর শুধু দূরে কান্নার মতন

ডাকছে, আর কোথাও কেউ নেই যেন। তখন তপনের মনে হয়, আমি কি ভীষণ একা, আমাকে কেউ ভালবাসে না।

দুপুর থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে, তপন স্কুল থেকে ভিজতে ভিজতে বাড়ি ফিরলো। আজ আর বিবেকানন্দ পার্কে খেলতে যাওয়া হবে না। ঘুঁড়ি ওড়ানোরও উপায় নেই। তপন এখন কি করে? গল্পের বইও কিছু নেই। সব পড়া বই—আর দাদার বইতে হাত দিলেই তো দাদা বলবে, বড়দের বই পড়তে নেই! কি হয় বড়দের বই পড়লে? তপন তো লুকিয়ে লুকিয়ে দাদার আলমারির তিন চারখানা বই পড়েছে, কিছু তো হয় নি! তবে বইগুলো বড্ড এক ঘেয়ে, খালি কথা আর কথা!

মা পাশের বাড়ির শান্তি পিসির সঙ্গে কথা বলছিলেন, সেখানে গিয়ে তপন দাঁড়াতেই ওঁরা চুপ করে গেলেন। তপন এখন বুঝতে পারে, চুপ করে যাওয়া মানে তার সামনে ওঁরা এখন কথা বলতে চান না। তপন সেখান থেকে চলে এলো। দাদার ঘরে দাদা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে আর লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খাচ্ছে। সেখানে যেতেই দাদা বকুনি দিয়ে উঠলো তুই এখন যা এখান থেকে!

তপন কোথায় যাবে? পাশের বাড়ির টুলটুলের সঙ্গে সে আগে ক্যারামা খেলতো। কিন্তু টুলটুলটা শাড়ী পরতে শিখে কি রকম যেন বদলে গেছে! এখন সব সময় সে মেয়েদের সঙ্গে মেশে, আর মাঝে মাঝে ফিস ফিস করে নিজেদের মধ্যে কি বলেই অমনি হাসিতে গড়িয়ে পড়ে! মেয়েদের সব সময়েই হাসি! ওদের এইজন্য ভালো লাগে না তপনের। টুলটুল এখন আর তার বন্ধু নয়। তবু তপন জানালা দিয়ে ডাকলো, এই টুলটুল, আয় ক্যারাম খেলবি? টুলটুল আয়নার সামনে চুল আঁচড়াতে ব্যস্ত। তপনকে রীতিমত অবজ্ঞা করে উত্তর দিল, না, আমি জামাইবাবুর সঙ্গে সিনেমায় যাবো!

তপন একা একা ছাদের সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলো। বৃষ্টির দিকে

তাকিয়ে রইলো একদৃষ্টে। তার খুব মন খারাপ। তাকে কেউ ভালোবাসে না।

আর দু'দিন পর, তপন রাস্তা দিয়ে তন্ময় হয়ে হেঁটে আসছিল। চোখ আকাশের দিকে, সে ঘুঁড়ির প্যাচ খেলা দেখছে। কোন ঘুঁড়িটা কাটবে, এটা না দেখা পর্যন্ত সে চোখ ফেরাতে পারে না। কালো চাঁদিয়ালটা দুলতে দুলতে আসছে। কতকগুলো রাস্তার ছেলে ছুটছে সেটাকে ধরার জন্য। ঘুড়িটা বকুল গাছেই আটকাতো, হঠাৎ গোঁৎ খেয়ে চলে গেল মাঝ রাস্তার দিকে, আর একটা বাচ্চা ছেলে তীরের মত ছুটে গেল সেদিকে।

তপন চেঁচিয়ে উঠলো, এই! এই! গাড়ি—একটা গাড়ি যে খুব কাছেই ছেলেটা দেখেনি! তপন আর থাকতে পারলো না, সে এক দৌড়ে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল ছেলেটাকে। তারপরেই কি হলো, তপনের আর জ্ঞান নেই!

কাছেই তপনের বাড়ি। পাড়ার লোক চিনতে পারলো। মটর গাড়িটার সঙ্গে ধাক্কা লেগেছে তপনের। বিশেষ কিছু নয় অবশ্য। সেই গাড়ির ড্রাইভার এবং অন্যান্য লোকরা ধরাধরি করে তপনকে নিয়ে এলো বাড়িতে।

—এই তপু! এই তপু!

যেন খুব দূর থেকে একটা ডাক শোনা যাচ্ছে। তপন আস্তে আস্তে চোখ মেললো। চোখের সামনেই তার মায়ের মুখ। কান্নায় ভেসে যাচ্ছে। বাবার মুখে কি দারুণ উৎকণ্ঠা। দাদা কোনোদিন এই সময় বাড়িতে থাকে না—দাদাও ব্যগ্রভাবে ডাকছে, এই তপু! বেচারামেরও মুখ শুকনো। টুলটুলও এসেছে, তার মুখ দেখেও মনে হয়, এক্ষুনি সে কাঁদবে।

তপনের আর ব্যথা নেই। তার খুব আরাম লাগছে। ঘরে সবার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, সবাই কি দারুণ উৎকণ্ঠিত তার জন্য। তপন বুঝতে পারলো এরা সবাই তাকে ভালবাসে। খুব ভালোবাসে!

খুব জোর বেঁচে গেছি

নৌকোর মাঝিকে আমি জিজ্ঞেস করলুম, আচ্ছা মাঝি ভাই, আপনি কখনো নিজের চোখে বাঘ দেখেছেন ?

মাঝি বললেন, না !

আমি অবাক।

সুন্দরবনের নদীতে যে মাঝি এতদিন ধরে নৌকো চালাচ্ছে, সে কখনো বাঘ দেখে নি ? অথচ এখানে এসে কতজনের মুখেই তো হিংস্র বাঘের গল্প শুনছি।

মাঝির বয়েস পঞ্চাশের বেশী হবে ! রোদে পোড়া শরীরটার রং লোহার মতন। গায়ে একটা ছেঁড়া গেঞ্জি। থুতনিতে একটু দাড়ি। মাঝির নাম মেদিনী মল্ল। খানিক আগেই তিনি আমায় বলেছিলেন যে প্রায় পনেরো ষোলো বছর বয়েস থেকেই তিনি নৌকো চালাতে শুরু করেছেন। এতদিনে কোনো বাঘ চোখে পড়েনি ও'র ?

আমি আবার জিজ্ঞেস করলুম, এখানে তো শুনেছি, এত বাঘ, সাপ, ডাকাত—

আমার কথায় বাধা দিয়ে মেদিনী মল্ল বললেন, না, দাদা, আমি বাঘ, সাপ, ডাকাত, ভূত কিছুই দেখিনি। আপনি একটা গান ধরেন তো !

আমার পাশে বসে ছিল দীনেশ। তাকিয়ে দেখি, সে মুচকি মুচকি হাসছে।

আমি দীনেশকে জিজ্ঞেস করলুম, দীনেশ, তুমিও কখনো বাঘ দেখো নি ?

দীনেশ মাথা নেড়ে বললো, না।

মেদিনী মল্ল বললেন, কই দাদা, একটা গান ধরুন না।

আমি আরও অবাক হলুম। দীনেশ এই সুন্দরবনেরই সাতজেলিয়া গ্রামের ছেলে। আর সাতজেলিয়া গ্রামেই নাকি একবার নদী সাঁতরে একটা মানুষ খেকো বাঘ এসেছিল। অথচ, দীনেশ বাঘ দেখেনি !

আমি জিজ্ঞেস করলুম, তোমাদের গ্রামে যখন বাঘ এসেছিল, তখন তুমি কোথায় ছিলে, দীনেশ ?

দীনেশ বললো, আমি তো কাঠের ব্যবসা করি, সেই কাজে তখন আমি ক্যানিং গিয়েছিলাম।

মেদিনী মল্ল আবার বললেন, আহা, একটা গান ধরেন না।

আমি বললুম, আমি কি গান জানি ? আপনিই বরং একটা গান শোনান।

অমনি মেদিনী মল্ল ভাঙা গলায় একটা গান শুরু করে দিলেন।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। নদীর দু'পাশেই জঙ্গল। এই নদী দিয়ে আরও কয়েক মাইল এগিয়ে গেলেই সমুদ্র। একটু আগে সেই দিকে সূর্য ডুবে গেল। এখনো কিন্তু পাতলা পাতলা আলো আছে আকাশে।

আমাদের নৌকো যাচ্ছিল নদীর এক ধার ঘেঁষে। ফরেস্ট অফিসে দীনেশ এসেছিল একটা কাজে। আমিও তার সঙ্গে। নৌকো ছাড়া এদিকে যাতায়াত করার আর কোনো উপায় নেই। পাশের জঙ্গলটা একেবারে চুপচাপ। একটা পাখিও ডাকছে না।

মেদিনী মল্ল ছাড়া আর একটি অল্প বয়েসী মাঝিও রয়েছে। সেও গান গাইতে শুরু করেছে মেদিনী মল্লের সঙ্গে। দীনেশ এক সময় তাকে ধমক দিয়ে বললো, অত জোরে নয়, আস্তে আস্তে গান করো।

এক জায়গায় নদী যেন অনেকটা ঢুকে গেছে জঙ্গলের মধ্যে, এমন মনে হলো। সে জায়গাটা অনেকটা হ্রদের মতন। সেদিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠলুম। জলে অসংখ্য কালো কী যেন ভাসছে।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, ওগুলো কী ?

দীনেশ বললো, ওগুলো হাঁস। মানস সরোবরের হাঁস, এই সময় এদিকে আসে।

আমি বললুম, তাই নাকি? নৌকোটা একটু ভেতরের দিকে নিয়ে চলো, দেখবো!

মেদিনী মল্ল গান থামিয়ে বললো, না, দাদা, ওদিকে এখন যাওয়া যাবে না।

আমি বললুম, কেন? একটুখানি চলুন না!

—না, দাদা, ওদিকে যাওয়ার এখন অসুবিধে আছে। ভাটার সময় ওদিকে যাওয়া যায় না।

আমি তবু মিনতি করে বললুম, দেখুন না চেষ্টা করে। একটুখানি কাছে চলুন, একসঙ্গে অত হাঁস আমি আগে কখনো দেখিনি!

অমনি নৌকোর মুখটা ঘুরে গেল সেই দিকে।

মেদিনী মল্ল বললেন, এ কী? এ কী?

ছোট মাঝিটি বললো, বাবু অত করে বলছেন, তাই একটুখানি ঘোরালাম।

দীনেশ তাকে ধমক দিয়ে বললো, এই চাঁদু, তুই কেন নৌকোর মুখ ফেরালি? বড় মাঝি বারণ করেছে।

মেদিনী মল্ল আবার নৌকোর মুখ সোজা করে এনে জোরে জোরে হাল চালালেন। কিন্তু নৌকোটা যেন কিসে আটকে গেল।

দীনেশ বলে উঠলো, এই রে!

আমি বললুম, কী হলো?

দীনেশ বললো, নৌকো চড়ায় ঠেকে গেছে।

মেদিনী মল্ল অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু নৌকো আর কিছুতেই নড়ে না। তিনি বকাবকি করতে লাগলেন ছোট মাঝিকে।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, চড়ায় আটকে গেলে কী হয়? নৌকো আর চলবে না?

দীনেশ বললো, বসে থাকতে হবে এখানে! জোয়ার এলে তখন আবার নৌকো ভাসবে।

—এখানে তো জল কম। জলে নেমে নৌকোটা ঠেলে দেওয়া যায় না?

—না।

তারপর আমরা সেইখানেই থেমে রইলুম অনেকক্ষণ। আমার কিন্তু বেশ ভালই লাগছিল। পাশেই ঘন জঙ্গল, একটু দূরেই হাজার হাজার মানস সরোবরের হাঁস। এর মধ্যে অন্ধকার হয়ে আকাশের এক কোণে চাঁদ উঠেছে।

গান থামিয়ে চুপ করে বসে আছেন মেদিনী মল্ল। ছোট মাঝিও চুপ। দীনেশ নৌকোর ওপরে শুয়ে পড়েছে।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, সবাই চুপ চাপ হয়ে গেলেন কেন? ও বড় মাঝি, সুন্দরবনের একটা কোনো গল্প বলুন না!

মেদিনী মল্ল বললেন, না, দাদা, আমি কোনো গল্প জানি না।

—আপনি নিজে না হয় বাঘ দেখেন নি, অন্য কেউ তো দেখেছে আপনার চেনা জানা? সেই গল্পই বলুন না!

—না, দাদা, আমার চেনা জানাও কেউ কিছু দেখে নি। ছোট মাঝিটি বললো, আমি একটা গল্প জানি।

মেদিনী মল্ল তাকে এক ধমক দিয়ে বললেন, এই ছোঁড়া তুই চুপ করতো! তোর জন্যই নৌকোটা আটকালো।

আমি বললুম, বলুক না ও কি গল্প জানে একটু শুনি!

মেদিনী মল্ল বললেন, আমি এখন ঘুমোবো। ও ছোঁড়া বকবক করলে আমার ঘুম আসবে না।

তারপর মেদিনী মল্লও কাত হয়ে শুয়ে পড়লেন।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলুম। কতক্ষণ পর জোয়ার আসবে কে জানে! এ রকম সুন্দর সন্ধ্যেবেলা আমার মোটেই ঘুমোবার ইচ্ছে নেই। এখন গল্প শুনতে বেশ ভালো লাগতো।

আমার ধারণা ছিল, নৌকোর মাঝিরা অনেক রকম গল্প জানে।

ফিসফিস করে দীনেশকে জিজ্ঞেস করলুম, তোমার দাদা বলছিলেন, সুন্দরবনের নদীতে খুব ডাকাতি হয়, তুমি কখনো ডাকাতের পাল্লায় পড়ো নি?

দীনেশ বললো, না!

—এখানকার জঙ্গলে একটু নামা যায় না?

—রাত্তিরে কি কেউ জঙ্গলে নামে?

—এদিকের জঙ্গলে কি বাঘের ভয় আছে?

—কী জানি!

—তা হলে জঙ্গলে নামতে ভয় কী? একটুখানি নামবো?

—কাল দিনের বেলা আপনাকে ভালো জঙ্গলে নিয়ে যাবো।

ছোট মাঝিটি একা একা গুন গুন করে গান গেয়ে উঠতেই মেদিনী মল্ল আবার তাকে ধমক দিলেন, ছোঁড়া, আবার শব্দ করছিস? বললাম না, আমি এখন ঘুমোবো, চুপ করে থাকবি?

তারপর সবাই চুপচাপ। আমিও বাধ্য হয়েই চুপ করে রইলুম।

নদীটা মাঝ রাত্তিরে একেবারে খালি। আর একটাও নৌকো নেই। জলের ওপর জ্যোৎস্না পড়ে চকচক করছে। দু'পাশে যত দূর দেখা যায়, শুধু জঙ্গল। একেবারে নিস্তব্ধ। মনে হয়, এই জঙ্গলে কোন জন্তু-জানোয়ার নেই, এমন কি পাখিও নেই। সুন্দরবনের বাঘের যত গল্প শুনেছি, সবই মনে হয় যেন বানানো।

কতক্ষণ বসে ছিলাম জানি না। এক সময় আমার নিজেরই একটু ঘুম পেয়ে গেল। আবার চোখ মেলেই দেখি, নৌকো চলতে শুরু করেছে, মধ্য নদী পেরিয়ে অনেকটা এ পারের দিকে চলে এসেছে।

জোয়ারের সময় নৌকো অনেক তাড়াতাড়ি চলে। আর এক ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে গেলুম সাতজেলিয়ায়।

নৌকো জেঠিতে লাগলো। যাতে আমি ওপরে ওঠবার সময়

পা পিছলে না পড়ে যাই, সে জন্য মেদিনী মল্ল আমার হাত ধরে সাবধানে ওপরে তুলে দিলেন। তারপর নৌকো বেঁধে সবাই মিলে বাঁধের ওপর উঠে দাঁড়াবার পর মেদিনী মল্ল আমায় বললেন, দাদা, আপনি বাঘের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন না? ও দীনেশ ভাই, টর্চটা এদিকে আনো তো!

দীনেশ টর্চটা জ্বালালো।

মেদিনী মল্ল আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে গেঞ্জিটা তুলে বললেন, এই দেখুন!

টর্চের আলোয় দেখলুম, ওঁর পিঠে লম্বা লম্বা কালা কালা দাগ।

দীনেশ বললো, এই তো মাত্র মাস ছয়েক আগে মেদিনীদাকে বাঘে ধরেছিল। আমরা আজ যেখানে গিয়েছিলুম, সেই জঙ্গলটার নাম ঝিলা ব্লক। ঐ জঙ্গলেই।

মেদিনী মল্ল বললেন, বাঘ প্রথমেই এসে পেছন থেকে লাফিয়ে পড়ে ঘাড় মটকে দেয়। সে ব্যাটা আমার ওপরেও তেমন ধারা লাফিয়েছিল। কিন্তু আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতেই ব্যাটা ঠিক যুৎসই ভাবে ধরতে পারে নি। থাবা মেরেছিল শুধু।

দীনেশ বললো, মেদিনীদার দারুণ সাহস। হাতে ছিল একটা গাছ কাটা কুড়োল। সেই অবস্থাতেই মেদিনীদা বাঘের মুখে কুড়োল দিয়ে মারে। তারপর অন্য লোকরাও হৈচৈ করে ছুটে আসে। তাই মেদিনীদা বড় বাঁচা বেঁচে যায়। নইলে একবার সুন্দরবনের বাঘের সামনে পড়লে কেউ সহজে বাঁচে না।

মেদিনী মল্ল বললেন, এই তো গত বছরেই রতনকে এক ব্যাটা বাঘে নিয়ে গেল, প্রায় আমার চোখের সামনে থেকে, কিছুই করতে পারলাম না।

আমি বললুম, তাহলে তখন কেন বললেন, কখনো বাঘ দেখেন নি?

মেদিনী মল্ল উত্তর দিলেন না।

দীনেশ বললো, যেখানে চড়ায় নৌকো আটকালো আজ, ঐ জায়গাটার নাম কালী চর। ঠিক ঐখানেই গত বছর আমি ডাকাতের পাল্লায় পড়েছিলুম। এই মেদিনীদার নৌকোতেই কাঠ নিয়ে আসছিলুম, তোমার মনে আছে, মেদিনীদা?

মেদিনী মল্ল বললো, মনে থাকবে না কেন? তিন তিনটে বন্দুক ছিল ডাকাতদের কাছে। ব্যাটারা তোমার গায়ের জামাটা পর্যন্ত খুলে নিল। এক ব্যাটা শুধু মুদু বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মারলে আমার মাথায়—

দীনেশ বললো, সন্ধ্যের পর ঐ সব জায়গায় ডাকাত বা বাঘের নাম করতে নেই নাম করলেই ওরা আসে। সুনীলদা, তুমি যখন বললে, বাঘের গল্প বলো ডাকাতের গল্প বলো, তখনই আমি মনে মনে ভাবলুম, সর্বনাশ। আজ একটা কিছু বিপদ হবেই। মনে মনে জপ করছিলুম, হে ভগবান, বাঁচাও! শেষ পর্যন্ত কিছু হলো না, বড় বাঁচা বেঁচে গেছি আজ।

মেদিনী মল্ল দু' হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললেন, হ্যা আজ খুব জোর বেঁচে গেছি!

কিউই

নিউজিল্যাণ্ডের একটি অদ্ভুত কৌতূহলী পাখির নাম কিউই। একে অদ্ভুত বলছি বিশেষ কয়েকটি কারণে। ডানাহীন পাখির কথা ভাবা যায় না। অথচ সত্যি সত্যি কিউই পাখির ডানা নেই, এমন কি লেজও নেই। এদের লম্বা ঠোঁট, ঠোঁটের শেষভাগে নাসারন্ধ্র। এদের বড় বড় পায়ের পাতা। সারা শরীরে এদের পশুর বড় বড় লোমের মতো পালকে ঢাকা থাকে। শরীরের রঙ অনুজ্জ্বল বাদামী। স্ত্রীকিউই পুরুষ কিউই-এর চেয়ে আকারে বড়। সাধারণতঃ স্ত্রী কিউই হয় ৪৫ সেন্টিমিটার লম্বা আর পুরুষ কিউই হয় ৩৫ সেন্টি-মিটার লম্বা। যেহেতু এদের ডানা নেই, তাই 'ভোঁভোঁ' (মরিশাসের উড্ডয়ন-ক্ষমতাহীন অধুনালুপ্ত পাখি), 'অ্যাক্' (উত্তর সমুদ্র অঞ্চলের ক্ষুদ্র ডানাওয়ালা পক্ষীবিশেষ। এরা ক্ষুদ্র ডানার সাহায্যে জলে সাঁতার কাটতে পারে, কিন্তু আকাশে উড়তে পারে না।) এবং অন্যান্য উড্ডয়ন-ক্ষমতাহীন পাখিদের মতো আকাশে উড়তে পারে না।

স্ত্রী কিউই-এর কণ্ঠস্বর কর্কশ, কিন্তু পুরুষ কিউই-এর কণ্ঠস্বর ভারী মিষ্টি। পুরুষ কিউই-এর মধুরতম কোমল স্বর 'কি'-র প্রত্যুত্তরে স্ত্রী কিউই বড্ড কর্কশ স্বরে উত্তর দেয় 'উই' শব্দ করে। এজন্যই নিউজিল্যাণ্ডবাসীরা এই অদ্ভুত পাখিটির নাম রেখেছে কিউই।

পুরুষ কিউই সমস্ত কাজ করে। এরা খড় এবং ছোট ছোট ডালপালা দিয়ে বাসা তৈরী করে, বাসা মেরামত করে, খাদ্য সংগ্রহ করে, স্ত্রী ও বাচ্চাদের পরিচর্যা করে, সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। স্ত্রী কিউই-এর কাজ শুধু ডিম-পাড়া। কখনো কখনো অবশ্য এরা একটু আধটু অন্যান্য কাজও করে। ডিম ফুটে

বাচ্চা বেরোবার সময় পুরুষ কিউই একটুও বাইরে না বেরিয়ে বাসায় থেকে এক সপ্তাহ ধরে সমস্ত কাজ করে ও ডিমের যত্ন নেয়।

নিউজিল্যাণ্ডবাসীদের কাছে কিউই-এর মাংস খুবই সুস্বাদু। তাই ওদেশে এই পাখিটিকে শিকার করা হয়। কোন কিছু দিয়ে প্রলুব্ধ করে, বা তাদের কান্না নকল করে, বা গাছের গুড়ির কোটরে ও মাটির গর্তে কুকুরের ঘ্রাণশক্তি ব্যবহার করে অতর্কিতে আক্রমণ করে কিউই শিকার করা হয়। কিউই পাখিরা গন্ধ শুঁকে সন্দেহ ধরতে পারে। চোখে কিছু স্পষ্ট দেখতে পারে না বলেই, এরা এমন পদ্ধতি গ্রহণ করে। মানুষের পদধ্বনি শুনেও এরা বুঝতে পারে, সম্মুখে বিপদ। এ সময় তারা অন্ধ-গতিতে ছুটতে গিয়ে অনেক সময় মানুষের বুটের তলায় চাপা পড়ে বা ঘেরা-বেড়াতে আটকা পড়ে বিপদ ডেকে আনে!

কিউইরা সাধারণতঃ শান্ত থাকে। কিন্তু কোন মুহূর্তে এরা ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে উঠলে বা বিপদে পড়লে সম্মুখে সজোরে লাথি মেরে বা অন্য কোনভাবে আঘাত করে মানুষের কোমল মাংস বিদীর্ণ করতে পারে। এরা লাথি মেরে বিড়াল, ইঁদুর, বেঁজি প্রভৃতি শত্রুদের প্রতিরোধ বা বিতাড়িত করতে পারে।

কিউইরা অত্যন্ত কর্মঠ, সাহসী এবং পরিশ্রমী। একজন আদর্শ বাবা ও স্বামী হিসেবেও এরা বেশ সুখ্যাত। কিউই নিউজিল্যাণ্ড-দ্বীপের একটি আশাবাদী চিহ্ন। এরা মানুষকে বাঁচার মতো বাঁচবার এবং সমৃদ্ধশালী হবার শিক্ষা দেয়। তাই কিউই নিউজিল্যাণ্ডের জাতীয় প্রতীক।

শালিক ও ছোটোকাকা

তিন জন তিন জায়গায় দাঁড়িয়ে। মিনি আর শান্তু দুটো জানলার ধারে, আর পিন্টু দরজার পাশে। কেউ কোন কথা বলছে না। মনে হতে পারে যেন ওদের তিন জনের মধ্যে খুব ঝগড়া, তাই তিন জন তিন দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে। ঘরের মধ্যে একটা আলপিন পড়লেও তার শব্দ শোনা যাবে।

ঠিক পাঁচ মিনিট বাদে শালিক পাখিটা ঢুকল ঘরে। ফর্‌-ফর্‌ করে দু-পাক ঘুরে তারপর বসল ডান দিকের দেয়ালের ঘুলঘুলিটা আঁকড়ে।

আর ঠিক তখনই স্প্রিং-এর মতন তিন জোড়া হাত ঝপাঝপ বন্ধ করে দিল দরজা আর জানলা দুটো। একেবারে নিখুঁত কাজ। শালিক পাখিটা কিছু সন্দেহ করারও সময় পায় নি।

পিন্টু চেঁচিয়ে বলল, পাখা বন্ধ করে দে! শিগগির পাখা বন্ধ করে দে!

মিনি পাখার সুইচ অফ্‌ করে দিল সঙ্গে সঙ্গে। আর আলোটা জ্বেলে দিল। তিন জনের মুখেই এবারে ফুটে উঠল জয়ের হাসি।

দরজা-জানলা বন্ধ হবার আওয়াজ পেয়েই শালিকটা উড়তে শুরু করেছিল, পাখার ব্লেড বাঁচিয়ে তিন পাক ঘুরেই সে বুঝে গেল ব্যাপারটা। শালিক পাখিরা খুব চালাক হয়। পিন্টুর বন্ধু টাব্‌লু এই কায়দায় একটা চড়াই পাখি ধরতে গিয়েছিল, কিন্তু সেই চড়াইটা জানলার কাঁচকে খোলা জানলা ভুল করে এমন জোরে ধাক্কা খেল যে আধ-মরা হয়ে গেল। পিন্টুরা ত তা চায় না। তারা জ্যান্ত আর সুস্থ অবস্থায় শালিকটাকে ধরতে চায়।

দরজার ঠিক সামনের দেয়ালটাতেই পিন্টুর ঠাকুর্দার একটা বেশ

বড় বাঁধান ছবি ঝুলছে। শালিকটা সেই ছবির ওপর বসে বেশ গাঢ় চোখে তাকাল ওদের দিকে। পাখিটা খুব যে একটা ভয় পেয়েছে তা মনে হল না। শালিকের চোখ দুটো কাজল টানা, সব সময় একটা অবাক-অবাক ভাব।

মিনি জিজ্ঞেস করল, এবারে কী করে ওটাকে ধরবি ?

পিণ্টু বলল, দ্যাখ না ও উড়ে উড়ে ক্লান্ত হয়ে যাবে, তারপর এক সময় ঝুপ করে মাটিতে পড়বে !

শানু বলল, কিন্তু ও ত উড়ছে না ! এক জায়গায় বসে আছে।

পিণ্টু ততক্ষণে বুক শেলফের পাশ থেকে একটা ফুলঝাড়ু বার করেছে।

আগে থেকে সব ব্যবস্থা করে রেখেছে পিণ্টু। তিন চার দিন ধরেই শালিকটা ঠিক দুপুরে এই সময়টায় ঘরের মধ্যে এসে ঘুল-ঘুলিতে কী যেন খোঁজে। আজ একটা দারুণ সুযোগ পাওয়া গেছে। বাবা অফিসে, মা গেছেন ছোটমাসিদের সঙ্গে সিনেমা দেখতে। গোবিন্দও এই সময় আড্ডা মারতে যায়। পিণ্টু তার দুই ছোট বোনকে বুঝিয়ে এই পাকা ব্যবস্থা করেছে।

সে অবশ্য শালিক পাখিটাকে মারতেও চায় না, পুষতেও চায় না। বাবা পাখি পোষা খুব অপছন্দ করেন। আর শুধু শুধু একটা পাখিকে পিণ্টু মারবে কেন ? শালিক ত আর মুরগি নয় যে রান্না করে খাওয়া যাবে।

পিণ্টু একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করতে চায়। সে শালিক পাখিটাকে ধরে দেখবে, ওরা পিড়িং শব্দটা করে কী করে ! যে কোন শালিক একটা জায়গা ছেড়ে উড়ে যাবার সময় ঠিক ঐরকম একটা শব্দ করবেই। ওটা কি ওদের ডানার শব্দ ? শালিক ত অন্য সময় পিড়িং করে ডাকে না। শালিকের ডাক ত কিচু-কুচু-কিচু-কুচু-ককেটাং-কটেটাং এই ধরনের। শুধু এক জায়গা ছেড়ে ওড়বার সময় ওরকম শব্দ করে কেন ? যেন, যে জায়গাটা ছেড়ে গেল,

সেখানে ঐ শব্দটা রেখে গেল। আর কোন পাখি ত এরকম করে না!

পিন্টু ফুল ঝাড়ুটা আস্তে আস্তে উঁচু করল শালিকটার দিকে। গভীর মনোযোগ দিয়ে শালিকটা সেটা দেখতে লাগল, খুব কাছে এসে পড়ার পর ঠাকুর্দার ছবি ছেড়ে সেটা উড়ে গেল ডান দিকের জানলার পর্দার পেলমেটের ওপর।

এবার কিন্তু সেই পিড়িং শব্দটা করল না।

পিন্টু আবার ফুল ঝাড়ুটা নিয়ে সেদিকে যেতেই শালিকটা অবিকল মানুষের গলায় বলে উঠল, ওহে মুর্খ বালক-বালিকাগণ! তোমরা আমায় ধরিতে পারিবে? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! এই ছাখ, আমি অদৃশ্য হইয়া যাইতেছি!

এই কথা বলেই শালিকটা পেলমেট ছেড়ে দিয়ে ঘরের চারপাশে ঘুরপাক খেয়ে উড়ল কয়েকবার। তারপর সত্যি সত্যি তাকে আর দেখা গেল না।

পিন্টুরা দারুণ অবাক হয়ে গেল তিনটে কারণে। প্রথম ত শালিকটা কথা বলল মানুষের মতন। ওর গলার আওয়াজ একদম ছোটকাকার মতন। ছোটকাকা ত থাকেন দুর্গাপুরে। আর শালিকটা সত্যিই অদৃশ্য হয়ে গেল?

শুধু অবাকই নয়, মিনি আর শানুর মুখও শুকিয়ে গেছে ভয়ে।

কিন্তু পিন্টু অত সহজে ঘাবড়াবার ছেলে নয়। সে বলল, নিশ্চয়ই ছোটকাকা ফিরে এসেছেন দুর্গাপুর থেকে। সে ছুটে গেল রাস্তার দিকে জানলার কাছে। কাচের পাল্লাটা সামান্য একটু ফাঁক করে এদিক ওদিক চেয়ে দেখল। হ্যাঁ, ঠিক দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন ছোট কাকা।

ছোটকাকা হাসতে হাসতে বললেন, কী হচ্ছে, অ্যাঁ? তখন থেকে সদরে বেল বাজাচ্ছি, কেউ দরজা খুলছে না!

পিন্টু বেশ রেগে গেছে। গম্ভীর ভাবে বলল, খুলছি।

জানলাটা আবার বন্ধ করে পিন্টু ফিরে এসে খুব সাবধানে দরজাটা খুলে বলল, মিনি যা ত সদর দরজা খুলে দিয়ে আয়!

আবার দরজা বন্ধ করে পিন্টু ঘরের চারপাশে তাকাল। শালিক পাখিরা মানুষের মত কথা বলতে পারে না, পিন্টু জানে আগেকার দিনে রূপকথার আমলে বলতে পারত বোধহয়। কিন্তু পাখিটা গেল কোথায়? ওপরের দিকে কোথাও নেই। পিন্টু বুক শেল্ফের পেছনে, পড়ার টেবিলের নিচে, সব জায়গায় তন্নতন্ন করে খুঁজল, কোথাও দেখা গেল না পাখিটাকে।

পিন্টু তখন ফুল ঝাড়ুটা হাতে নিয়ে সারা ঘর দৌড়ে দৌড়ে হুস্ হুস্ করে শব্দ করতে লাগল। তবু কোন পাত্তা নেই।

ছোটকাকা দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ে বললেন, পেলি না ত? দৌড়ে দৌড়ে তুই নিজেই ক্লান্ত হয়ে যাবি, তখন শালিক পাখিটা তোকে দেখে হাসবে।

পিন্টু খানিকটা অভিমানের সুরে বলল, পাখিটা কোথায় গেল বল ত ছোট্কা? কিছুতেই ত ঘরের বাইরে যেতে পারে না!

ছোটকাকা বললেন, তুই জানিস না, শালিক পাখিরা হল পাখিদের মধ্যে ম্যাজিশিয়ান! ওরা অদৃশ্য হতে পারে, মানুষের গলা নকল করতে পারে, অন্যরকম চেহারা ধরতে পারে।

পিন্টু অবিশ্বাসের সুরে বলল, যাঃ!

ছোটকাকা বললেন, বিশ্বাস করছিস না আচ্ছা সব জানলা দরজা খুলে দে।

পিন্টু খুলে দিল সব দরজা-জানলা।

ছোটকাকা বললেন, এর মধ্যে শালিকটা বেরিয়ে যায় নি ত? আর কোন শালিক ঢুকেছে? তাও ঢোকে নি! তা হলে ঐ ছাখ!

ছোটকাকা আঙুল তুললেন, আর পিন্টুরা সেই দিকে তাকিয়ে দেখল, ঠাকুর্দার ছবির ওপর পাশাপাশি দুটো শালিক বসে আছে!

ছোটকাকা হাততালি দিতেই দুটো শালিক এক সঙ্গে পিড়িং শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল জানলা দিয়ে।

ছোটকাকা বললেন, ওরা ঐ পিড়িং শব্দ করে কেন জানিস। ওটাই হল ম্যাজিকের মন্ত্র। ওর মানে হল "হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা?"

পিন্টুরা হাঁ করে চেয়ে রইল ছোটকাকার দিকে।

—×—